আমার জীবন

শ্রীমতী রাসসুন্দরী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং প্রাইভেট্ লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

ভূমিকা

এ গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা; শুধু তাহা নহে, ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব, সেইখানে পেন্‌সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্‌সিলের দাগে গ্রন্থকলেবর ভরিয়া গেল। বস্তুতঃ ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

ইঁহার আত্মজীবনী পড়িয়া মনে হয় ইনি একজন আদর্শ-রমণী। যেমন গৃহধর্ম্মে নিপুণা, তেমনি ধর্ম্মপ্রাণ ও ভগবদ্‌ভক্ত। শৈশবে ইনি অতিশয় ভীরুস্বভাব ছিলেন। সেই সময়ে ইঁহার জননী, ইঁহার ভয় নিবারণার্থ ইঁহাকে একটি অভয় মন্ত্র প্রদান করেন। সেই অবধি, সেই অভয় মন্ত্রটি অক্ষয় কবচরূপে তাঁহাকে চিরজীবন রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন,—"ভয় হইলেই দয়ামাধবকে ডাকিও।" শোকে, তাপে, ভয়ে, এই মন্ত্রটিই তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। আজকাল "ধর্ম্মশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা" করিয়া খুব একটা হৈ-চৈ উঠিয়াছে, আসল কথা, মা শিশুর সুকুমার হৃদয়ে শৈশবে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিলে যেরূপ সুফল হয়, পরে শত শত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেও তাহা হয় না। ইঁহার জীবনের আর একটি বিশেষত্ব—লেখাপড়া শিখিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ।

লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোন সুবিধা ঘটে নাই। তখনকার কালে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা দোষের মধ্যে গণ্য হইত। তিনি আপনার যত্নে, বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপিপাসাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে উত্তেজিত করে। নভেল নাটক পড়িতে পারিবেন বলিয়া নহে—পুঁথি পড়িতে পারিবেন বলিয়াই—"চৈতন্য ভাগবত" পড়িতে পারিবেন বলিয়াই লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ!

ইঁহার ধর্ম্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পর্য্যবসিত নহে, ইঁহার ধর্ম্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন; এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। এরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবন সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের দেশে ঈশ্বরের নামে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঠিক পৌত্তলিকতা

বলা যায় না ; তাহা ঈশ্বরের স্মারক চিহ্ন মাত্র। তাহাতে পৌত্তলিকতার সঙ্কীর্ণ ভাব নাই। খৃষ্টানেরা হিন্দুকে যে ভাবে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, হিন্দুর পৌত্তলিকতা সে ভাবের নহে। লেখিকার জননী লেখিকাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতেই এই কথা প্রতিপন্ন হইবে :

"আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন ? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বস্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন। সেই পরমেশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন ; এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর, পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের ? মা বলিলেন, এই এক পরমেশ্বর সকলের, সকল লোকই তাঁকে ডাকে, তিনিই আদিকর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভালবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।"

ইহা অপেক্ষা উন্নততর ঈশ্বরের কল্পনা আর কি হইতে পারে ? এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা আবশ্যক ; এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।

বালীগঞ্জ
২০ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

গ্রন্থপরিচয়

গ্রন্থকর্ত্রী মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল।"

এই জীবনীখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দুরমণীর একটি খাঁটি নক্সা। যিনি নিজের কথা সরল ভাবে কহিয়া থাকেন, তিনি অলক্ষিতভাবে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়া যান। "আমার জীবন" পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দুরমণীগণের সকলের কথা; এই চিত্রের মত যথাযথ ও অকপট মহিলাচিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

হিন্দুসমাজে পুরমহিলা যেখানে অবস্থিত ছিলেন, এখন আর তিনি সেখানে নাই,—এই হিসাবে এই চিত্রখানি অমূল্য। রাসসুন্দরী বা তাঁহার মত আর কেহ জীবনের শেষ সীমান্তে দাঁড়াইয়া একথা না বলিয়া গেলে তাহা আর বলা হইত না। সেকেলে রমণীচরিত্র ভয়, লজ্জা ও গ্রাম্য সংস্কারের মধ্যে কি ভাবে বিকাশ পাইত, তাহার এমন সুস্পষ্ট ও জীবন্ত ছবি আমরা আর দেখি নাই। পল্লীরমণীর একহস্ত পরিমিত অবগুণ্ঠন কিরূপে প্রৌঢ়বয়সে সীন্তের সিন্দুর স্পর্শ করিয়া তাঁহার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি উন্মোচন করিয়া দেখাইত, কন্যা হইতে বধূ, বধূ হইতে গৃহিণী ও জননীরূপে তিনি কিরূপে বিকাশ পাইতেন তাহা এমন বিশ্বস্তসূত্রে আমাদের আর জানিবার উপায় ছিল না।

সাধারণতঃ কবিগণ প্রেমকে কেন্দ্রবর্ত্তী করিয়া রমণী চরিত্র আঁকিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দুর গৃহ শুধু পতিপত্নীর নিজস্ব গৃহ নহে; যিনি গৃহিণী, তিনি কন্যা, ভগ্নী, ননদী, পুত্রবধূ, কর্ত্রী এই সর্ব্ববিধরূপে সুযশ অর্জ্জন না করিতে পারিলে এই সমাজে তিনি প্রশংসা পাইতেন না, অথচ কবিগণ সচরাচর তাঁহাকে এই গণ্ডী হইতে পৃথক করিয়া প্রেমলীলার স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়া থাকেন, রমণীর সমগ্র চিত্রটি আমরা প্রায়ই কাব্য বা উপন্যাসে দেখিতে পাই না। স্বাভাবিক লজ্জাশীলতায় রাসসুন্দরী এই প্রেমের অঙ্কটিই স্বজীবন হইতে বাদ দিয়াছেন,—তাঁহার জীবনের অপরাপর দিক দ্বিগুণতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি বা ঔপন্যাসিক যে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাসসুন্দরী সেই স্থান হইতে কথা আরম্ভ

করিয়াছেন ; কোন পুরুষ শত প্রতিভাবলেও রমণীহৃদয়ের গূঢ় কথার এমন আভাস দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

সেকেলে রমণী সমাজের সম্পূর্ণ বশ্য ছিলেন। কে কি বলিবে, এই ভয় তাঁহার চিত্তে যেরূপ প্রবল ছিল, এই স্বেচ্ছাতন্ত্রযুগে তাহার একটা পরিমাণ করা যায় না। শুধু কে কি বলিবে তাহা নহে, কে তাঁহার মুখখানি দেখিয়া ফেলিবে—নিন্দুকের জিহ্বা নাচিয়া উঠিবে, এই লজ্জায় তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া যেভাবে লুকাইয়া থাকিতেন তাহা এখন কল্পনা করা সহজ নহে। তিনি লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন, এ কথা শুনিলে গুরুজনের গণ্ড লজ্জায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিত, ক্ষুধিত হইলে তিনি চাহিয়া খাইতে পারিতেন না,—বধূবেশী হিন্দুরমণী সহিষ্ণুতা ও ত্যাগশীলতার একখানি মৌন ছবিবিশেষ ছিলেন। এই প্রকার অবস্থা সমূহ অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত একজন হিন্দুরমণী কি ভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব কি প্রকার, তাঁহার মন কি ছন্দে গড়া—ইহা জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিবার কথা, এই কৌতূহল রাসসুন্দরী অপর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করিয়াছেন।

এখন আমরা তাঁহার জীবনের কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব। অমর কোষে রমণীর আর একটি প্রতিশব্দ 'ভীরু'। এই নাম কিরূপ সার্থক, তাহা রাসসুন্দরীর জীবনে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। বাল্যকালে ভয় তাঁহাকে একবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। বালিকা শুনিয়াছিল, যদি কেহ কাহাকে মারে তবে তাহাকে ছেলেধরায় লইয়া যায়। এই ছেলেধরার ভয়ে রাসসুন্দরী দিনরাত অস্থির থাকিতেন। "আমাকে যখন কোন ছেলে মারিত, তখন ভয়ে আমি বড় করিয়া কাঁদিতাম না, উহাকে ছেলে ধরায় লইয়া যাইবে, কেবল এই ভয়ে আমার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত।" অনেক সময় ছেলেধরার কথা মনে হওয়ামাত্র তাঁহার দুইচক্ষু জলপূর্ণ হইত, এই অবস্থায় এক সঙ্গিনী একদিন আসিয়া বলিল, "উনি একটি সোহাগের আরশি, কিছু না বলিতেই কাঁদিয়া উঠেন, এই বলিয়া আমার মুখে একটা ঠোক্না মারিল।" একদিন একজন গোবৈদ্য দেখিয়া ছেলেধরা ভাবিয়া "ভয়ে এককালে মৃতপ্রায় হইলাম, তখন আমার মনে এত ভয় হইয়াছিল যে, আমি দুই হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।" শুধু ছেলেধরার ভয় নহে, একদিন দুইটি ছোট ভাই সহ নদীর ঘাটে যাওয়ার পরে একটি ভাই বলিল—"দেখিতেছি এ সকল শ্মশান, মড়ার বিছানা পড়িয়া আছে। ঐ মড়ার নাম শুনামাত্র আমার অত্যন্ত ভয় হইল ; সে

ভয় যেন হা করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিল।" প্রৌঢ় বয়সের প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছেন—আমার মন সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত হইত, সে ভয় আমার মনে কে দিয়াছিল, আবার কাহার বল অবলম্বন করিয়াই বা সে প্রবল ভয় পরাস্ত হইল ?

কেহ মারিলে বালিকা ভয়ে কিছুই বলিত না, "সকলে জানিত, আমাকে মারিলে আমি কাহারও নিকট বলিব না, আমি সকল বালিকাকে ভয় করিতাম, এজন্য গোপনে গোপনে সকলে আমায় মারিত।" একদিন একটি সঙ্গিনী-বালিকা রাসসুন্দরীর ছেলে সাজিয়া তাহাকে ঠকাইয়া তাহার সমস্ত ফল ও জলপান খাইয়া ফেলিল এবং বলিল, "আমাকে আঁচাইয়া দাও।" জল না পাওয়াতে সে সঙ্গিনীর আদেশ পালন করিতে পারিল না—"আমার সঙ্গিনী এই অপরাধে আমাকে একটি চড় মারিল, আমি মার খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে আমার খেলার সাথী আব একটি বালিকা সেইস্থানে ছিল, সে উহাকে বলিল,—'তুমি কেমন মেয়ে, উহার সকল জলপান খাইয়া ফেলিলে, আম দুটাও খাইলে, আবার উহাকে কান্দাইতেছ ? আমি গিয়ে উহার মায়ের কাছে বলিয়া দিই।" এই কথা শুনিয়া বালিকা আরও বিচলিত হইয়া পড়িল। এই সকল বালসুলভ শত শত অকথার মধ্যে রাসসুন্দরীর যে মূর্ত্তিটি চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিরসহিষ্ণু, ক্ষমাশীলা বঙ্গমহিলারই আদত ছবি। রাসসুন্দরী পরমাসুন্দরী ছিলেন, অষ্টাশী বৎসর বয়সে তাহা জানাইতে তিনি কোন সঙ্কোচবোধ করেন নাই।

রাসসুন্দরী নিজের দোষের অংশ বাদ দিয়া শুধু গুণের ভাগ দেখাইয়া যান নাই। তিনি পুস্তকের এক স্থানে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি যদি আপনার নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া কিছু গোপন করিয়া থাকি, তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। আমার যে কথা স্মরণ না থাকে তাহা তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও। আমি যে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিব বা কথা বলিব, এমন চেষ্টা আমার কথনই নাই।"

শৈশবে সকলে তাহাকে বোকা-মেয়ে বলিয়া ডাকিত। বস্তুত পঁচিশ বৎসর বয়সেও তিনি এমন সকল কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে আমাদের হাস্যের উদ্রেক করে—সে সকল কথা তিনি অকপটে লিখিয়া গিয়াছেন। একদিন নদীতীরে দুইটি ভাই সহ বালিকা বড় বিপন্ন হইয়াছিল; মাতা শিখাইয়াছিলেন, "বিপদে পড়িলে দয়ামাধবকে ডাকিও।" দয়ামাধব সেই বাড়ীর স্থাপিত বিগ্রহ। সেইদিন

আৰ্ত্ত-হইয়া বালিকা বলিল, "দাদা দয়ামাধবকে ডাক।" তখন আমরা তিনজনে দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম।" সেই সময়ে জনৈক পথিক তাহাদিগের চীৎকার শুনিয়া দয়াপূর্ব্বক তাহাদিগকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। পরদিন বালিকা কথাপ্রসঙ্গে ছোট ভাইকে বলিল, 'হাঁ, দয়ামাধব আমাদের কোলে করিয়া বাড়ীতে আনিয়াছেন'। ইহা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল,—'ছি! দিদি কি বলিলে? দয়ামাধব কি মানুষ, দয়ামাধবের মুখে কি দাড়ি আছে?" এই বিষয়টির মীমাংসার জন্য মাতৃসকাশে উপস্থিত হইলে মাতা হাসিয়া রাসসুন্দরীকে বলিলেন—"তোমার ছোটভাই যে সকল কথা বুঝে, তোমার বুদ্ধি নাই, তুমি কিছুই বুঝ না।'

এই সময়ে বালিকা মাতার নিকট পরমেশ্বর কিরূপে সাহায্য করেন, তাহার কথা শুনিয়াছিলেন, সেই কথায় তাহার যে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাই তাহার ভাবী জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত ও নিয়মিত করিয়াছিল। মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "দয়ামাধব তোমাদের কান্না শুনিয়া ঐ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন।"

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা তিনি আরও অনেক স্থলে সরলভাবে কহিয়া গিয়াছেন—"যখন আট নয় বৎসরের ছিলাম, তখন আমাকে কত লোক পরিহাস করিয়া বলিত, তোমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমার বুদ্ধি এমনই ছিল, আমি সেই কথায় বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন আমার পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম তখনও সেই বুদ্ধির শিকড় কিছু কিছু ছিল।' তাহার শ্বশুরবাড়ীতে একটা ঘোড়া ছিল তাহার নাম জয়হরি। একদিবস আমার বড় ছেলেটিকে ঘোড়ার উপর চড়াইয়া বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোকে বলিল, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার; তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ, দেখ, ছেলে কেমন করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে দেখ। আমি ঘরে থাকিয়া জানিলাম ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে—তবে বড় লজ্জার কথা।"

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে রাসসুন্দরীর বিবাহ হয়, তখনও তিনি বিবাহ কি ভাল জানিতেন না। তিনি বড়ই সোহাগে পালিতা। একদিন শুনিলেন তাঁহার জননী তাঁহাকে অপরের হস্তে দিবেন। বালিকার বড় অভিমান হইল,—এই কথা বড় দুঃসহ হইল। তিনি মাকে যাইয়া বলিলেন, "মা আমাকে যদি কেহ চাহে,

তবে কি তুমি আমাকে দেবে?" মা বলিলেন, "ষাট, তোমাকে কাহাকে দিব, এ কথা তোমাকে কে বলিয়াছে?" কিন্তু বিবাহের আয়োজন হইল, বালিকা বেশ স্ফূর্তি বোধ করিল। হুলুধ্বনি, বাজনা, হলুদমাখা, এ সকল আনন্দের মধ্যে যে তাহাকে চিরদিনের জন্য মাতার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা হইতেছে; তাহা সে জানিত না। বিবাহান্তে বরপক্ষ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে, খুব ধুমধাম পড়িয়া গেছে—"তখন আমি ভাবিলাম, ঐ যাহারা আসিয়াছিল, এখন বুঝি তাহারাই যাইতেছে। এই ভাবিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মায়ের সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলাম······দেখিলাম কতক লোক আহ্লাদে পূর্ণ হইয়াছে, কতক লোক কাঁদিতেছে, উহাই দেখিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। ক্রমে আমার দাদা, খুড়ী, পিসী এবং মা প্রভৃতি সকলেই আমাকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঐ সকল কান্না দেখিয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। ঐ সময়ে আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, মা আমাকে এখনই দিবেন। তখন আমি মায়ের কোলে গিয়া মাকে আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলাম, আর মাকে বলিলাম, "মা তুমি আমাকে দিও না।" আমার ঐ কথা শুনিয়া, এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া ঐ স্থানের সকল লোক কাঁদিতে লাগিল। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া অনেক মত সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—'মা আমার লক্ষ্মী, তুমি তো বেশ বুঝ, ভয় কি, আমাদের পরমেশ্বর আছেন, কেঁদ না। আবার এই কয়দিন পরেই তোমাকে আনিব।" তখন আমার এত ভয় হইয়াছে যে, আমার শরীর থরথর কাঁপিতেছে। আমার এমন হইয়াছে যে, মুখে কথা বলিতে পারিনা; তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "মা! পরমেশ্বর কি আমার সঙ্গে যাবেন?"

শ্বশুরবাড়ী রামদিয়া গ্রাম তিনদিনের পথ, যেদিন সেই গ্রামে উপনীত হইবেন, সেদিন নৌকার সকলে বলিতে লাগিল—"আজ আমরা বাটি যাইব।" তখন আমার মনে একবার উদয় হইল বুঝি আমাদের বাটিতেই যাইব। সেই রাত্রে নৌকা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, এ বাড়ী—সে বাড়ী নহে, তখন "হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমার এমন হইল যে চক্ষে শতধারায় জল পড়িতে লাগিল।"

এখন আর সকল স্থলে শ্বশুরবাড়ী-যাত্রিনীর এরূপ কান্নাকাটি নাই—এ চিত্র প্রাচীনকালের খাঁটি চিত্র। প্রাচীন গান, প্রাচীন কাব্য এই করুণ কাহিনীতে পরিপ্লুত। এই চিত্র দেখিতে দেখিতে—"বল দেখি মা, উমা কেমন ছিলি মা, ভিখারী হরের (ই) ঘরে," কিম্বা "উমা এল বলি রাণী এলোকেশে ধায়," "গিরি আমার গৌরী এসেছিল; স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায়

লুকাইল," প্রভৃতি ময়নাসারলিক্ষিত প্রাচীন গানগুলি মনে পড়িয়াছে,—কন্যাবিরহে জননীর আকুল অশ্রুসিক্ত মুখখানি ও বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের আগ্রহ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। দুধের বালিকা—একান্ত অবোধ, তাহার বাধা দিবার শক্তি নাই, আঘাত দিলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়—এইরূপ শিশুকন্যাকে অপরের গৃহে পাঠাইবার সময় সমস্ত পল্লীখানি মৌনবেদনায় কম্পিত হইয়া উঠিত। এই চিত্র এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবেসিত হইতে চলিয়াছে। এই স্মৃতিটুকু আমরা বড় ভালবাসি।

শ্বশুরবাড়ীতে যাইয়া বালিকার সজল চক্ষু দুটি আত্মীয়গণের বৃথা সন্ধান করিত,—"পক্ষীটা, কি গাছটা, কি কুকুরটা, কি বিড়ালটা, যা দেখিতাম তাহাতে আমার জ্ঞান হইত যে আমার বাপের বাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া কাঁদিতাম।" এই দুঃখের সময় "আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।"

"তাঁহার সেই কোল যেন আমার মায়ের কোলের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি যেরূপ স্নেহের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি আমার মা। অথচ তিনি আমার মায়ের আকৃতি নহেন। আমার মা বড় সুন্দরী ছিলেন। আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী শ্যামবর্ণা এবং আমার মায়ের সহিত অন্য কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি তিনি কোলে লইলে আমি মা জ্ঞান করিয়া চক্ষু বুজিতাম।"

রাসসুন্দরী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এ কি অপূর্ব্ব ঘটনা! কোন্ গাছের বাকল কোন্ গাছে লাগিল।—তাহাদের কাছে সকল দিন থাকিতে থাকিতে আমি তাহাদের পোষা পাখী হইয়া তাহাদের শরণাগত হইলাম—।'

রাসসুন্দরী বড় আদুরে মেয়ে ছিলেন, পিতৃগৃহে তাঁহাকে কেহ কাজ করিতে দিতেন না, কিন্তু এক জ্ঞাতি খুড়ী অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, বালিকা লুকাইয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সমস্ত কাজ এমন কি রন্ধনাদিও করিয়া দিত। এই ভাবে তিনি কাজ শিখিয়াছিলেন। বালিকা একদিন সেই বুড়ীর বাড়ীতে তাঁহার মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেছিল, সেই সময় তাহার পিসীমা আসাতে সে ভয়ে লুকাইয়া রহিল। সে লুকাইয়া রহিয়াছে কেন অনুসন্ধান করিয়া পিসীমা জানিলেন—সে কাজ করিতেছিল—তাহাকে কাজ করিতে দেখিলে যদি তিনি কিছু বলেন, এই ভয়ে সে পালাইয়াছে। পিসীমা এই সংবাদ মায়ের নিকট লইয়া আসিলেন, মাতা আহ্লাদে তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"মা কাজ কোথায় শিখিয়াছ, কাজ করিয়া দেখাও দেখি।"

কিন্তু আমোদে আহ্লাদে যাহা শিখিয়াছিলেন, বিপুল কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্ত অচিরে তাহার প্রয়োজন হইল। বিবাহের পর যৌবনের প্রারম্ভে শ্বশুরবাড়ীর বৃহৎ সংসারের ভার রাসসুন্দরীর উপর পড়িল। "এই সংসারটি বড় কম নহে, দস্তুরমতই আছে—বাটিতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন—তাঁহার সেবাতে অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ হয়। বাটিতে অতিথি পথিক সতত আসিয়া থাকে। এদিকে রান্না বড় কম নহে। আমার দেবর ভাশুর কেহ ছিলেন না বটে, কিন্তু চাকর-চাকরাণী ২৫।২৬ জন বাটির মধ্যে ভাত খাইত, তাহাদিগকে পাক করিয়া দিতে হইত। বিশেষতঃ ঠাকুরাণী চক্ষুহীন হইয়াছেন, তাহার সেবাও সর্ব্বোপরি।" তখনকার মেয়েছেলেদের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে বৌ হইবে, সে হাত খানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না। সেকালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা কাপড় ছিল। "আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম, আর যে সকল লোক ছিল, কাহার সঙ্গেই কথা কহিতাম না। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না।"

এই সমস্ত কঠোর সামাজিক আচার রাসসুন্দরী প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছেন। ইহা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে মানাইয়া গিয়াছিল, তাই অশোভন হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"বস্তুতঃ পরমেশ্বর যখন যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তাহা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সেই কালের লোকের সেই মোটা মোটা কাপড়, ভারি ভারি গহনা, হাতপোরা শাঁখা—কপালভরা সিন্দুর, বড় বেশ দেখাইত।"

সাংসারিক অসামান্য শ্রমের পরে, অনেক দিন রাসসুন্দরীর খাওয়া হইত না, হয়ত অপরাহ্নকালে সকলকে খাওয়াইয়া নিজে খাইতে বসিবেন, এমন সময় অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুখের গ্রাস তাহাকে দিয়া নিজে উপবাসী রহিলেন। একদিনকার ইতিহাস তিনি দিয়াছেন। মুখের গ্রাস এক নমঃশূদ্র অতিথিকে দিয়া আর সেদিন খাওয়া হইল না। এরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল যে ক্রমাগত দুইদিন তিনি কিছু খাইতে অবকাশ বা সুবিধা পাইলেন না—অথচ বাড়ীর কেহ তাহা জানিতে পারিল না। সেই ইতিহাস পড়িতে গেলে পাঠক অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না—অথচ এইরূপ মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রায়ই উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন খাটিতে হইত। "আমি ঘরের মধ্যে একা, আর অন্য কোন লোক নাই—ঘরে খাবার নানাদ্রব্য আছে। আমি খেলেও খেতে পারি, কে বারণ করে? বরং

আমাকে খাইতে দেখিলে ঘরের লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে, কিন্তু আমি ভাত ছাড়া অন্য জিনিষ আপনি লইয়া খাইতাম না।" এই অন্নপূর্ণামূর্ত্তি হিন্দুস্থানের নিজস্ব, জগতে কোথাও ইহার তুলনা নাই। এই ত্যাগশীলা করুণাময়ী মূর্ত্তি যদি আধুনিক বিলাসকলায় মলিন হইয়া থাকে, তাহা হইতে দুর্দ্দশা আমাদের আর কিছুই নাই।

গৃহের কাজ ছাড়া সেকালের রমণীগণ একটু শিল্পচর্চ্চা করিতেন। তাহা বিলাসের সামগ্রী লইয়া নহে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর প্রীতির হস্ত নিপুণভাবে শোভাদান করিত, তাহাতে বাঙ্গালীর কুটিরখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। "সে সময় কেবল কড়ি ছিল, কড়িতেই সকল কারবার চলিত, আমি ঐ কড়ি আনিয়া নানাবিধ জিনিষ তৈরী করিতে আরম্ভ করিলাম। ঝাড়, পদ্ম, আরশি, ছত্র, আলনা, শিকা, এই সকল বানাইয়া ঘরে লটকাইয়া রাখিতাম। আর পাথর কাটিয়া ক্ষীরের ছাঁচ বানাইবার জন্য সঞ্চ বানাইতাম। মাটি দিয়া পুতুল, ঠাকুর, সাপ, বাঘ, মানুষ, গরু, পক্ষী ইত্যাদি যা দেখিতাম তাহাই বানাইতাম।"

মোটকথা রাসসুন্দরীর এই জীবন কথা আমরা শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারি না। সমস্ত প্রাচীন সমাজ চিত্রখানি যেন তাঁহাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাসসুন্দরী এক বিষয়ে তাঁহার সময়ের আচার ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্য যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তদুদ্দেশ্যে ডুবালাদির যত্ন অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। কেহ দেখিবে এই ভয়ে তিনি লোকসমক্ষে কোন পুস্তকের দিকে দৃষ্টি করিতেও ভীত হইতেন, অথচ গোপনে অসাধারণ চেষ্টায় অক্ষরপরিচয় সমাধা করেন। কিন্তু লুকাইয়া পাঠ করিতে শেখা বরং সহজ—একখানি পুস্তকের পাতা অঞ্চলে লুকাইয়া বরং নির্জ্জনে পড়া চলে; কিন্তু "লিখিতে বসিলে তাহার অনেক আয়োজন লাগে, কাগজ, কলম, কালি দোয়াত চাহি। তাহা লইয়া ঘটা করিয়া সাজাইয়া বসিতে হয়।" এইরূপ ভাবে ধরা পড়িবার আশঙ্কা খুব বেশী। রাসসুন্দরী প্রৌঢ় বয়সে যে উৎকট যত্নে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। অপত্যস্নেহে মাতার চিত্তে আধ্যাত্ম্য শক্তি (Psychical power) বিকাশ করিয়া দেয়, এ সম্বন্ধে রাসসুন্দরী যে দুই তিনটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ববিত্তার সভায় আদার লাভ করিবে। 'আমরাও তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব মনে করি না। তাঁহার এক প্রবাসী-পুত্রের মৃত্যুর বিষয় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, প্রকৃত মৃত্যু ঘটনা তারিখাদি সকল বিষয়ে ঠিক তেমনি হইয়াছিল।

সঙ্গীহীন অন্তঃপুরের নির্জ্জনতায় ও নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম এবং শতপ্রকার কষ্টে আত্মানুসন্ধান ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক। রাসসুন্দরীর পুস্তক আদ্যন্ত ধর্ম্মের কথায় পূর্ণ। শেষাংশে এই ধর্ম্মতত্ত্ব একটু বেশী নিবিড় হইয়া ইতিহাসের দিকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে—শেষাংশটি প্রথমাংশের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তাহার রাশি রাশি ভগবৎ স্তোত্র তাহার ভক্তির পরিচায়ক—কিন্তু তাদৃশ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহার গ্রন্থভাগের ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সরল—এরূপ খাঁটি বাঙ্গালা আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। এই বাঙ্গালা এত সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী যে আধুনিক বাক্যপল্লবপূর্ণ অনেক রচনা এই খাঁটিভাষা পাঠের পর বিরক্তিকর বোধ হইবে।

পুস্তকখানিতে প্রাচীন পুরনারীগণের যে চিত্রটি আছে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের মহিলাগণ একবার যত্নের সহিত দেখিবেন এই অনুরোধ। আমরা কুন্দনন্দিনীর প্রতি অতি প্রশংসা প্রদান করিয়া যেন গৃহের অন্নপূর্ণার প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হই—ইহাই কামনা। পরিবর্ত্তন অর্থেই উন্নতি নহে—বেশবিন্যাস বাহ্য চাকচিক্য মাত্র—প্রাচীনকালের দোষগুণ লইয়া হিন্দুরমণীগণ যে মূর্ত্তিতে গৃহখানিকে স্নেহ ও ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ করিয়া রাখিতেন—সেই পবিত্র প্রভাবিরহিত হইলে হিন্দুর গৃহস্থলীর প্রকৃত শোভা চলিয়া যাইবে। বাহিরে আমরা অপমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, লাঞ্ছিত ও পরমুখাপেক্ষী—গৃহ ভিন্ন আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? বাঙ্গালীর গৃহের গৃহিণীগণ কিরূপ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই চিত্রখানি আমরা বিশ্বের দ্বারে সগৌরবে উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারি।

দীনেশচন্দ্র সেন

মঙ্গলাচরণ

বন্দে সরস্বতী মাতা, তুমি বল বুদ্ধিদাতা,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তব বাধ্য।
সদয় হইয়া মনে, বৈস মম হৃদাসনে,
প্রণমিব পদে যথাসাধ্য॥
অবোধ অবলা কন্যা, নিজগুণে কর ধন্যা,
যাতে মম পূরে অভিলাষ।
এই আশা করি মনে, তব প্রিয়পতি সনে,
আমার কণ্ঠেতে কর বাস॥

প্রথম রচনা

জীবন-চরিত

কোথা বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বেশ্বর।
হৃদয়ে বসিয়া মম বাঞ্ছা পূর্ণ কর॥
অজ্ঞান অধম আমি তাহে নারী ছার।
তব গুণ বর্ণিবারে কি শক্তি আমার॥
তবু তব কীর্ত্তন করিতে সাধ মনে।
রাসসুন্দরীকে দয়া কর নিজগুণে॥

১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।

আমার এই শরীর, এই মন, এই জীবনই কয়েক প্রকার হইল। আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, কোন্ সময়ে কি প্রকার ছিল, এবং কোন্ অবস্থায় কত দিবস গত হইয়াছে, সে সমুদয় আমার স্মরণ নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমার মনে আছে, তাহাই লিখিতেছি:

চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব কি প্রকার ছিল, তাহা আমি কিছুই জানি না; সে সমুদয় আমার মা জানেন। পরে যখন আমি ছয় সাত বৎসরের ছিলাম, তখনকার কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। যাহা আমার মনে আছে তাহাই লিখিতেছি। তখন আমি প্রতিবাসিনী বালিকাদিগের সঙ্গে ধূলা-খেলা করিতাম। ঐ সকল বালিকা বিনা অপরাধেই আমাকে মারিত। আমার মনে এত ভয় ছিল যে, আমি মার খাইয়াও বড় করিয়া কাঁদিতাম না, কেবল দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইত। আমার যদি অতিশয় বেদনা হইত সে জন্যও কতক কাঁদিতাম, কিন্তু আমার কাঁদার বিশেষ কারণ এই, যে আমাকে মারিয়াছে, আমাদের বাটীতে সকলে শুনিলে উহাকে গালি দিবেন। আর একটি কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিতাম: এক দিবস আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন,

তুমি কোনখানে যাইও না। তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মা। যাব না কেন? তখন আমার মা বলিলেন, আজ বড় ছেলে-ধরা আসিয়াছে, সে ছেলে পাইলে ছালার মধ্যে পুরিয়া লইয়া যায়। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মনে এত ভয় হইল যে, আমার এককালে মুখ শুকাইয়া গেল। আমার ঐ সকল ভয়ের লক্ষণ দেখিয়া আমার মা তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, যাট, তোমার ভয় নাই। যে সকল ছেলে দুষ্টামি করে এবং ছেলেপিলেকে মারে, ঐ সকল ছেলেকে ছেলে-ধরায় লইয়া যায়। তোমার ভয় কি, তোমাকে লইয়া যাইবে না।

মার ঐ কথা আমার মনে মনেই থাকিল। যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত, তখন মার ঐ কথা আমার মনে পড়িত। মা বলিয়াছেন যে ছেলে ছেলেপিলেকে মারে তাহাকে ছেলে-ধরায় ধরিয়া লইয়া যায়। অতএব যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত, তখন ভয়ে আমি বড় করিয়া কাঁদিতাম না। উহাকে ছেলে-ধরায় ধরিয়া লইয়া যাইবে, কেবল এই ভয়ে দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। আমাকে মারিয়াছে এই কথাও কাহারও নিকট বলিতাম না। আমি কাঁদিলে কেহ শুনিবে এই ভয়ে মরিতাম। সকলে জানিত, আমাকে মারিলে আমি কাহার নিকট বলিব না। আমি সকল বালিকাকে ভয় করিতাম, এজন্য গোপনে গোপনে সকলেই বিনা অপরাধে আমাকে মারিত।

এক দিবস আমার সঙ্গিনী একটি বালিকা আমাকে গোপনে বলিল, তোমার মায়ের কাছে গিয়া জলপান চাহিয়া আন। আমরা দুই জনে গঙ্গাস্নানে যাই। শুনিয়া আমি ভারী আহ্লাদিত হইয়া মায়ের নিকট গিয়া বলিলাম, মা! আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। মা হাসিয়া বলিলেন, গঙ্গাস্নানে যাইবে, কি চাও। আমি বলিলাম, একটা বোচ্‌কা চাই। গঙ্গাস্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না; এই মাত্র জানি, পথে বসিয়া জলপান খায়, আর কাপড়ে একটা বোচ্‌কা বাঁধিয়া মাথায় করিয়া পথে হাঁটিয়া যায়। আমার মা আমার ঐ সকল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একখানি কাপড়ে কিছু জলপান,

দুটি আম বাঁধিয়া একটি পুঁটলি করিয়া আমাকে আনিয়া দিলেন। তখন ঐ পুঁটলি দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হইল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এখন তাহার শতগুণ বেশী আহ্লাদের কাজ হইলেও তেমন আহ্লাদ মনে বোধ হয় না। আহা! সে যে কি আহ্লাদের দিন ছিল, তাহা বলা যায় না। তখন আমি ঐ পুঁটলি লইয়া সেই বালিকার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। পরে এক পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া জলপান খুলিলাম। তখন আমার সঙ্গিনী বালিকা আমাকে বলিল, দেখ, তুমি যেন আমার মা, আমি যেন তোমার ছেলে। তুমি আমাকে কোলে লইয়া খাওয়াইয়া দাও। তখন আমি বলিলাম, তবে তুমি আমার কোলের কাছে বৈস। তখন সে আমার কোলের কাছে বসিল। আমি বলিলাম, আচ্ছা তবে খাও। এই বলিয়া ঐ সকল জলপান উহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে সে বলিল, আঁচাইয়া দাও। তখন আমি ভারি বিপদে পড়িলাম। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আমি জলে নামিয়াও জল আনিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমার সঙ্গিনী ঐ অপরাধে আমাকে একটা চড় মারিল। আমি মার খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি অমনি দুই হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমাকে মারিতে কেহ বুঝি দেখিল, এই ভয়ে আমি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম।

ঐ সময়ে আমার খেলার সঙ্গিনী আর একটি বালিকা সেই স্থানে ছিল। সে উহাকে বলিল, তুমি কেমন মেয়ে! উহার সকল জলপান খাইলে, আম দুটাও খাইলে, আবার উহাকে মারিয়া কাঁদাইতেছ। আমি গিয়া উহার মায়ের কাছে বলিয়া দিই। এই বলিয়া সে আমাদের বাটীতে গিয়া সকলের নিকট বলিয়া পুনর্ব্বার আমাদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি তোমার মায়ের কাছে সকল কথা বলিয়া দিয়াছি। দেখ এখনি, কি করে। ঐ কথা শুনিয়া আমার ভারি

ভয় হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনী বালিকা বলিল, উনি একটি সোহাগের আরসী, কিছু না বলিতেই কাঁদিয়া উঠেন। এই বলিয়া আমার মুখে আর একটা ঠোকনা মারিল। তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল, আমি চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি সোহাগের আরসী হইয়াছি, না জানি, আমার কি হইল! তখন আমার এই ভয়ই হইতে লাগিল, আজি আমাকে ছেলে-ধরা ধরিয়া লইয়া যাইবে, উহাকেও বুঝি লইয়া যাইবে। এই ভয়ে আমি আমাদের বাটীতে না গিয়া ঐ গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনীব বাটীতেই গেলাম। তখন উহার মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া উহাকে বলিল, উহার মুখ লাল হইয়াছে কেন? তুমি বুঝি উহাকে কাঁদাইয়াছ? এই বলিয়া তাহার মা তাহাকে গালি দিল। সে তাহার মায়ের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। পরে তাহার মা গেলে, সে আমাকে বলিল, দেখ, আমার মা আমাকে গালি দিল, আমি তো তোমার মত কাঁদিলাম না। তুমি যেমন আহ্লাদে মেয়ে হইয়াছ। তুমি বুঝি তোমার মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিবে। তখন আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, না, আমি মায়ের কাছে গিয়া কিছুই বলিব না; ইহা বলিয়া আমি বিষণ্ণবদনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাটী হইতে একজন লোক আসিয়া আমাকে বাটী লইয়া গেল। আমি বাটী গিয়া দেখিলাম, সকলেই আমার ঐ সকল কথা বলিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গঙ্গাস্নান হইয়াছে বলিয়া আরও হাসিতে লাগিল। তখন আমার খুড়া, দাদা এবং অন্যান্য সকলেও বলিতে লাগিলেন, আর এ সকল মেয়েদের সঙ্গে উহাকে খেলিতে দেওয়া হইবে না। কল্য হইতে উহাকে বাহির বাটীতেই রাখা যাইবে। তখন সে একদিন ছিল, এখানকার মত মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখাপড়া করিত। একজন মেমসাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কাল রঙের একটা ঘাগরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই

স্কুলে মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, আমি সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম। ভয়ে আমি আর কোন দিকে নড়িতাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর। তখন আমার শরীরের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সকলে যাহা বলিত, যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি ঃ

বর্ণ টি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল॥
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি।
বলিত সকলে মোরে সোণার পুতুলী॥

আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। আমার মুখে পরিষ্কৃত হইয়া কথা বাহির হইত না। যে দুই একটি কথা বাহির হইত, সেও আধ-আধ, তাহা শুনিয়া সকলে হাস্য করিত। আমাকে যদি কেহ বড় করিয়া ডাকিত, তাহা হইলেই আমার কান্না উপস্থিত হইত। বড় কথা শুনিলেই, আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। এজন্য আমার সঙ্গে কেহ বড় করিয়া কথা কহিত না; আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। মেয়েছেলের মত আমাকে বাটীর মধ্যে রাখা হইত না। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষরে মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়ই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। সেকালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না। আমাকে পরিজনেরা সমস্ত দিন বাহিরে রাখিতেন। কেবল স্নানের সময়ে বাটীর মধ্যে আনিয়া স্নান আহারের পরেই আবার বাহিরে রাখিয়া আসিতেন, আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীর মধ্যে আনিতেন। এই প্রকার সকল দিবস আমি স্কুলে সেই মেম সাহেবের কাছেই বসিয়া থাকিতাম। তখন আমার মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ভয় যেন আমার মন এককালে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যদিও মনে কখনও একটু অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত, অমনি ভয় আসিয়া চাপা দিয়া রাখিত।

দ্বিতীয় রচনা

ধন্য ধন্য প্রভু তুমি ধন্য ত্রিভুবনে।
কত ধন্যবাদ দিব এ এক বদনে ॥
ধন্য তব দয়া, ধন্য নিয়ম তোমার।
ধন্য তুমি মায়ারূপে বেপেছ সংসার ॥
ধন্য তব অপরূপ সৃষ্টি মনোহারী।
ধন্য তব কৌশলের যাই বলিহারি ॥
ধন্য এই চন্দ্র সূর্য্য ধন্য বসুমতী।
ধন্য পশু পক্ষী ধন্য বৃক্ষ বনস্পতি ॥
কত মনোহর রূপে পৃথিবী উজ্জ্বল।
তাহে পবনের গতি অতি সুশীতল ॥
সুরধুনি-প্রবাহিনী নদী শত শত।
সৌরভ-বাহিনী কত বর্ণিব বা কত ॥
রাসসুন্দরীর জন্ম ধন্য করি গণি।
শ্রবণে পরশে তব নামামৃত-ধ্বনি ॥

এক দিবস আমার খুড়া বাহির বাটী হইতে আমাকে বাটীর মধ্যে আনিতেছেন, ঐ সময়ে একজন গোবৈদ্য একখানা ছালা ঘাড়ে করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া ছেলে-ধরা ভাবিয়া ভয়ে এককালে মৃতপ্রায় হইলাম। তখন আমার মনে এত ভয় হইয়াছিল যে, আমি দুই হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সে স্থানে যত লোক ছিল, তাহারা আমাকে ভয় নাই, ভয় নাই, বলিয়া হাসিয়া মহাগোল করিতে লাগিল। আমার খুড়া আমাকে কোলে লইয়া বাটীর মধ্যে গিয়া বলিলেন, আজ ভাল ছেলে-ধরার হাতে পড়িয়াছিলাম; এই বলিয়া তিনি এবং সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

তখন আমার মায়ের কাছে গিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমার এত ভয় কেন? ভয় নাই, কিসের ভয়, ছেলে-ধরা নাই, ও সকল মিছা

কথা, আমাদের দয়ামাধব * আছেন, ভয় কি? তোমার যখন ভয় হইয়ে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না। মার ঐ কথাতে আমার মনে অনেক সাহস হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মা বলিয়াছেন ছেলে-ধরা নাই, আর আমাদের দয়ামাধবও আছেন, এই বলিয়া কিছু স্থির হইলাম। বিশেষ আমি একাও কোনখানে যাইতাম না। আমার সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকিত। বাস্তবিক আমার মত ভয় কোন ছেলের দেখা যায় না। এমন কি, বুড়া মানুষ দেখিলেই আমার দাঁত লাগিত, এজন্য আমাকে একা রাখা হইত না। আমার এক পিসী ছিলেন; তিনি অতি অল্পকালেই বিধবা হন। আমার বুদ্ধির অগোচরে তিনি বিধবা হইয়াছেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিসি! তোমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহনা নাই কেন? পিসী বলিলেন, আমার বিবাহ হয় নাই। সেইজন্য আমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহনা নাই। পিসীর ঐ কথায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল। আমি যত বিধবা দেখিতাম আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইত যে উহাদের বিবাহ হয় নাই। চারি বৎসরের সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সকল বিষয় আমি কিছুই জানি না। এক দিবস আমি সেই স্কুলে মেমসাহেবের নিকট বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া আমার খুড়াকে বলিলেন, রায় মহাশয়! আপনি বুঝি মঙ্গল ঘট বসাইয়া সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই বলিয়া খুড়ার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কন্যাটি কাহার? আমার খুড়া বলিলেন, এ কন্যাটি পদ্মলোচন রায়ের। ঐ কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবিত হইলাম, আমার মন এককালে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এত দিবস আমি জানিতাম, আমি মায়ের কন্যা। বিশেষ আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমি এই কথা যত ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার মন বিষণ্ণ হইতে লাগিল। পরে আমি বাটীর মধ্যে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! আমি কাহার কন্যা? মা আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর কিছু

---

* আমাদের বাটীতে যে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন তাঁহার নাম দয়ামাধব।

বলিলেন না। তখন আমি পিসীর নিকট গিয়া বলিলাম, পিসি! আমি কাহার কন্যা? পিসী আমার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ঐ কান্না দেখিয়া এককালে অবাক্ হইলাম। পিসী কিজন্য কাঁদেন ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্না সম্বরণ করিয়া বলিলেন, হা বিধাতঃ! তুমি এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছ? অজ্ঞান সন্তান পিতৃস্নেহ কিছুই জানিল না! পিসী এই বলিয়া আমাকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি কাহার কন্যা জান না? তুমি পদ্মলোচন রায়ের কন্যা। ঐ কথা শুনিয়া আমি নীরব হইয়া থাকিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, কি প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মন আমার কিছুতেই স্থির হইল না। তখন আমি বলিলাম, পিসি! আমি কেমন করিয়া পদ্মলোচন রায়ের কন্যা হইলাম। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এমন নির্ব্বোধ মেয়ে কোথা ছিল কিছুই বুঝে না। শুন বুঝাইয়া দিই, তোমার পিতা তোমার মাতাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেইজন্য তুমি তাঁহার কন্যা।

শুনিয়া আমার অধিক চিন্তা হইতে লাগিল। আমি ভাবিয়া ভাবিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম, তিনি তবে কোথা গিয়াছেন? পিসী বলিলেন, মা! ও কথা বলিয়া আর জ্বালাইও না, তিনি মরিয়াছেন। ঐ মরা নাম শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। আমার কাছে যদি মরা আইসে, তবে আমি সেই দয়ামাধবকেই ডাকিব। এই ভাবিয়া মনকে কতক স্থির করিলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের বাটীর কাছে এক বাটীতে এক দিবস রাত্রে আগুন লাগিয়াছে, তখন আমরা তিনজন ছোট। আমার দুই বৎসরের বড় এক ভাই, আর আমার দুই বৎসরের ছোট এক ভাই, ইহার মধ্যে আমি। আমাদের বাটীর নিকট একটা মাঠ আছে। সেস্থানে লোকের বসতি নাই এবং বৃক্ষাদি কিছুই নাই; কেবল ক্রোশখানেক অন্তরে একটা নদী আছে। তখন আগুন দেখিয়া আমাদের বাটীর নিকটস্থ ঐ মাঠে সকলে জিনিস-পত্র সকল বাহির করিতেছে। সেইস্থানে

আমাদের তিন জনকেও রাখা হইয়াছে। সে বাটীতে আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তথাকার সকল লোক চীৎকার শব্দ করিতেছে। কত লোক কান্না আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের বাঁশ গুয়া চটপট করিয়া শব্দ করিতেছে, নানা প্রকার গোল হইতেছে। আমরা তিনজনে কাঁদিতেছি। ঐ আগুন যখন আমাদের বাটীতে লাগিয়া এককালে প্রজ্বলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন আমাদের জ্ঞান হইল, যেন আগুনে পুড়িয়া মরিলাম। এই ভাবিয়া তিনজনে কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ মাঠের দিকে চলিলাম। তখন আমরা এক একবার পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি আগুন জ্বলিতেছে। আমরা আরও দৌড়িয়া যাইতে লাগিলাম। তখন আমরা কি পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম তাহা বলা যায় না। আমরা আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিলাম।

নদীর কূলে যে স্থানে আমবা আছি, সে স্থান সমুদয় শ্মশান। খাট, গদি, বালিস, চাটাই, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে আমরাই তিন জন ভিন্ন আর লোক নাই। ইতিমধ্যে দাদা বলিলেন, দেখিতেছি, এ সকল শ্মশান, মড়ার বিছানা পড়িয়া আছে। ঐ মড়ার নাম শুনিবামাত্র আমার অত্যন্ত ভয় হইল। সে ভয় যেন হা করিয়া আমাদের গ্রাস করিতে আইল, এই মত জ্ঞান হইতে লাগিল।

আমরা তিন জনে প্রাণপণে কাঁদিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার মনে হইল, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। তখন আমি বলিলাম, দাদা! দয়ামাধবকে ডাক। তখন আমরা তিন জন দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, আর কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমাদের কান্না যে কেহ শুনিবে, সে এমন স্থান নহে। এদিকে নদী, ওদিকে প্রজ্বলিত অগ্নির ভীষণ-ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইতে লাগিল; মনুষ্যের কলরব এবং পরস্পরের কান্নায় পরস্পরে দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তখন আমাদের কান্না কে শুনে! যেখানে আমরা আছি, সেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই। তখন আমাদের যে কি প্রকার ভয় উপস্থিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। তখন আমরা তিন জনে ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে

মৃতপ্রায় হইলাম। আমাদের কাঁপিতে কাঁপিতে এই মাত্র ধ্বনি মুখে ছিল, দয়াময়! দয়াময়!

ঐ নদীর অপর পারে কয়েক ঘর লোকের বসতি। তাহারা কয়েকজন ঐ আগুন দেখিয়া এ পারে আসিতেছে। ঐ নদীর এক জায়গায় অল্প জল ছিল, তাহারা সেই জায়গা দিয়া হাঁটিয়া পার হইল। পরে এ পারে আসিয়া আমাদের কান্না শুনিয়া একজন বলিল, এ নদীর কূলে কাহার ছেলের কান্না শুনি। আর একজন বলিল, ওরে! এ রায় মহাশয়দের বাটীতে আগুন লাগিয়াছে, এ বুঝি তাঁহাদের বাটীর ছেলেরা কাঁদিতেছে। এই বলিয়া ভয় নাই, ভয় নাই বলিতে বলিতে আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের তিন জনকে কোলে লইয়া ঐ আগুন দেখিতে চলিল।

এদিকে আমাদিগকে না দেখিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে বলিয়া সকলে হাহাকার শব্দ করিতেছে এবং আমাদের বাটীর সকলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন। এমত সময়ে ঐ কয়েকজন লোক আমাদিগকে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদিগকে পাইয়া অমনি আমাদের বাটীর সকলে আমাদিগকে কোলে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমাদের হারানতে আমাদের বাটীর জিনিস-পত্র আর কিছুই বাহির করা হয় নাই। ঘর-দরজা জিনিস-পত্র এককালে সকলই পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাতেও কাহার মনে কিছু খেদ হইল না, আমাদিগকে পাইয়া সকলে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাটীতে আমাদের রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে বাটীতে আসিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, আমাদের বাটীর সমুদয় পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল পোড়া জিনিস স্থানে-স্থানে রাশি রাশি পড়িয়া আছে। বেগুন গাছে বেগুন, বেল গাছে বেল এবং কলা গাছে কাঁদি সহিত কলা পুড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পোড়া হাঁড়ি, পাতিল, খুঁটি, মুছি ভাঙ্গাচুরা পড়িয়া আছে। এই সকল দেখিয়া আমার মনে ভারি আহ্লাদ হইল। তখন আমি এ সমুদয় পোড়া জিনিস-পত্র আনিয়া খেলা করিতে লাগিলাম; আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। বাড়ী পুড়িয়া গেলে সেই পোড়া ভিটার উপর

পরমান্ন দিতে হয়, সেই পরমান্ন আমাদিগকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বাটীতে যে দয়ামাধব বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতেও পরমান্ন ভোগ হইয়া থাকে। আমরা ঐ ভিটায় পরমান্ন খাইতেছি, ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই বলিল, এ পরমান্ন আমাদের দয়ামাধবের প্রসাদ। আমি তাহার বড়, আমার তাহার অপেক্ষা বেশী বুঝার সম্ভব; অতএব আমি বেশ বুঝিয়াছি এবং নিশ্চয় জানিয়াছি, ঐ যে লোকে নদীর কূল হইতে আমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছে, সে-ই দয়ামাধব।

আমার ছোট ভাইয়ের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, হাঁ, দয়ামাধব আমাদের বড় ভালবাসেন। কল্য দয়ামাধব আমাদের কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল, ছি দিদি, কি বলিলে? দয়ামাধব কি মানুষ? দয়ামাধবের মুখে কি দাড়ি আছে? তখন আমি বলিলাম, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। কল্য আমরা ভয় পাইয়া দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, এজন্য দয়ামাধব আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন। আমার এই কথা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল, সে দয়ামাধব নহে, সে মানুষ। ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে আমার মা আইলেন এবং আমার কান্না দেখিয়া বলিলেন, উহাকে কাঁদাইতেছ কেন? তাঁহার নিকট আমার ছোট ভাই আন্ত অন্ত সকল কথা বলিল, মা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মা কি জন্য যে হাসিতেছেন, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে মা বলিলেন, তোমার ছোট ভাই সে সকল কথা বুঝে। তোমার বুদ্ধি নাই, কিছুই বুঝ না। এস, আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া মা আমাকে কোলে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় রচনা

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
বিষয় বিষেতে জরা মনে।
তাহাতে শকতিহীন, মৃত্যু প্রায় নিশিদিন,
আছি নাথ তব অদর্শনে॥
লজ্জা ভয়ে অঙ্গ দয়, কি বিবন্ধ দয়াময়,
কি করিব না দেখি উপায়।
অধিনীর অনুরোধে, ত্বরায় প্রকাশ হৃদে,
কৃপা করি ওহে দয়াময়॥
করুণার কল্পতরু, কৃপাসিন্ধু বিশ্বগুরু,
কর দৃষ্টি করুণা নয়নে।
অকূল তরঙ্গে পড়ি, ভাসিছে রাসসুন্দরী,
তোমার চরণ-তরি বিনে।

আমার মা বলিলেন, এই যে, আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন, তাঁহারি নাম দয়ামাধব, তিনি ঠাকুর। কল্য তোমাদের যে লোক নদীর কূল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল, সে মানুষ। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি বলিয়াছিলে, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও, আমাদের দয়ামাধব আছেন। তবে যে কালি যখন ভয় হইল, আমরা 'দয়ামাধব, দয়ামাধব' বলিয়া কত ডাকিলাম, আইলেন না কেন? মা বলিলেন, ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 'দয়ামাধব, দয়ামাধব' বলিয়া ডাকিয়াছিলে। দয়ামাধব তোমাদের কান্না শুনিয়া, ঐ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব স্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন।

সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাঁহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া

ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন; এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ, ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদি কর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভালবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।

বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর বলে, তাহাই শুনিয়া থাকি—এই মাত্র জানি। মা বলিলেন, তিনি ঠাকুর, এজন্য সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর, তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন, তবে আর কিসের ভয়, এখন যদি আমার ভয় করে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে, মা বলিয়াছেন, আমাদের পরমেশ্বর আছেন।

সেই দিবস হইতে মায়ের মহামন্ত্র পরমেশ্বর নামটি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। আমি আট বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদিগের সঙ্গে ধূলা-খেলা করিতাম। আর দুই বৎসর বাহির বাটীর স্কুলে মেম সাহেবের নিকট বসিয়া থাকিতাম। এই অবস্থায় দশ বৎসর গত হইয়াছে। পরে আমাদের বাটী পুড়িয়া গিয়া বাটীর স্কুল ভাঙ্গিয়া গেল। সেই হইতে আমার বাহির বাটী যাওয়া রহিত হইল। আর আমি বাহির বাটীতে যাইতাম না, বাটীর মধ্যেই থাকিতাম। আমার মামা গৃহশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার ছোট একটি ছেলে ছিল, আমার মা ঐ ছেলেকে আনিলেন। আমি ঐ ছেলেটিকে দেখিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইলাম। ঐ ছেলেটিকে আমি সকল দিবস কোলে করিয়া রাখিতাম, উহাকে লইয়াই আমি খেলা করিতাম, সে-ছেলেটিও আমার কাছে

থাকিতে থাকিতে আমার ভারি শরণাগত হইল। আমি তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতাম। এমন কি স্নান, আহার, নিদ্রা সকল সময়েই সে আমার কোলে থাকিত, আমি তাহাকে একবারও কাঁদিতে দিতাম না।

আমাদের বাটীর নিকট জ্ঞাতি খুড়ার বাটী আছে। সেই বাটীতে এক খুড়ীমা ছিলেন। আমি ঐ ছেলেটি লইয়া সেই খুড়ীমার নিকট সকল দিবস থাকিতাম। সে-বাটীতে অধিক লোক ছিল না, খুড়ারা তিন জন, আর খুড়ীমা, আর ছেলেপিলে কয়েকটি মাত্র। সে খুড়ীমার হাতে পায়ে রস-বাতের বেদনা ছিল। আমি ঐ ছেলে লইয়া সকল সময় খুড়ীমার কাছে থাকিতাম, তিনি ঐ সংসারের সকল কাজ করিতেন, আর আমার কাছে বসিয়া ঐ সকল কাজের কথা বলিয়া বলিয়া কাঁদিতেন। আর বলিতেন, আমার মরণ হইলেই বাঁচি, আমি আর কাজ করিতে পারি না।

খুড়ীমার ঐ সকল খেদোক্তি শুনিয়া আমার মনে ভারি কষ্ট হইত। তখন আমি কোন কাজ করিতে জানি না, তথাপি খুড়ীমার কষ্ট দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এক দিবস আমি বলিলাম, তুমি বসিয়া থাক, আমি কাজ করি। তিনি বলিলেন, তুমি কি কাজ করিতে পার? আমি বলিলাম, আমাকে বলিয়া দিলে আমি সকল কাজই করিতে পারি। তিনি বলিলেন, তোমাকে তো কোন কাজ করিতে দেখিনে, তুমি কি কাজ জান, বিশেষ তোমাকে কাজ করিতে কেহ দেখিলে আমাকে গালি দিবে। তখন আমি বলিলাম, তুমি কাহারও নিকট বলিও না, আমাকে বলিয়া দাও, আমি কাজ করি।

তখন তিনি বলিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, আমি আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া সকল কাজ করিতে লাগিলাম। এই প্রকার করিয়া আমি ক্রমে ক্রমে ঐ খুড়ীমার কাছে যাবতীয় কাজ করিতে শিখিলাম। তিনি বসিয়া পাক করিতেন, আমি ঐ পাকের সমুদয় প্রস্তুত করিয়া দিতাম, এই প্রকার কাজ করিতে করিতে আমিও পাক করিতে শিখিলাম। আমি ঐ বাটীর সকলকে পাক করিয়া দিতাম। আমি যে এ সকল কাজ শিখিয়াছি, আমাদের বাটীতে কেহ জানিত না। সেই

খুড়ীমা আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন, আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতাম।

এই প্রকারে কিছু দিবস যায়। এক দিবস আমি সেই খুড়ীমার মাথাতে তৈল দিতেছিলাম। ইতিমধ্যে আমার পিসী আসিলেন। আমি পিসীমাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিলাম, তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, মা! আমাকে দেখিয়া লুকাইলে কেন? তখন আমার ঐ খুড়ীমা বলিলেন, আমার মাথাতে তৈল দিতেছিল, পাছে তুমি কিছু বল, এই ভয়ে পলাইয়াছে। ঐ কথা শুনিয়া পিসী হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে আমাকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিলেন, তুমি কি এখন কাজ করিতে পার, কাজ কোথায় শিখিয়াছ? খুড়ীমা বলিলেন, মেয়েতো বেশ কাজ জানে। আমি হাত-পায়ের বেদনাতে নড়িতে পারি না, ওই আমার সকল কাজ করিয়া দেয়। আমি উহার জন্যেই বাঁচি। পিসী শুনিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে কোলে লইয়া, আমাদের বাটীতে গিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা শুনিয়াছ, এই মেয়ে কত কাজ শিখিয়াছে, ও বাড়ীর বৌ রস-বাতে মরে, কোন কাজ করিতে পারে না, সে বলিল, তাহার সকল কাজ, এমন কি, রান্না পর্য্যন্ত এই মেয়ে করিয়া দেয়। আমাদের বাটীর সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল, আমার মা আমাকে কোলে লইয়া আহ্লাদে ভাসিতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, মা! কাজ কোথা শিখিয়াছ, কাজ করিয়া একবার দেখাও দেখি। তখন আমি আমাদের বাটীতেও কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই হইতে আমি বাটীর কাজ করিতাম। কিন্তু আমাদের বাটীতে আমাকে কেহ কাজ করিতে দিতেন না, আমি গোপনে গোপনে কাজ করিয়া রাখিতাম, তাহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কত সোহাগ করিতেন। সেই হইতে আমার ধূলা-খেলা ভাঙ্গিল; আর খেলা ছিল না, আমি কেবল কাজই করিতাম।

এইরূপে সংসারের সমুদয় কাজ শিখিয়াছি। তুই বৎসর পর্য্যন্ত আমি ঐ বাটীতে খুড়ীমার কাছে সেই ছেলেটিকে লইয়া সকল দিবস থাকিতাম। ছেলেটি আমার কাছে থাকিতে থাকিতে আমার ভারি

অনুগত হইল। আমিও তাহাকে এক তিল ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। দৈবাৎ সে ছেলেটি পীড়িত হইয়া মারা গেল। ছেলেটি মারা গেলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তখনও আমি ঐ খুড়ীমার কাছেই থাকিতাম। তখন আমার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণ বার বৎসর। এত দিবস আমার এই সকল অবস্থায় গত হইয়াছে। এই বার বৎসর কাল আমি আমোদ-আহ্লাদে পরিবারের নিকটে মার কোলে নির্ভাবনায় সুখে ছিলাম।

পরে ক্রমে ক্রমে আবার ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ বার বৎসরে আমার বিবাহ হয়। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। এক দিবস আমি খিড়কির ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি, সে সময়ে ঘাটে অনেক লোক আছে। ইতিমধ্যে আমাকে দেখিয়া একজন লোক বলিল; এ মেয়েটিকে যে পাইবে, সে কৃতার্থ হইবে, সে কত কাল কামনা করিয়াছে। আর একজন বলিল, উহাকে লইবার জন্য কতজন আসিতেছে, দিলে এক্ষণেই লইয়া যায়, উহার মা দেয় না। আর একজন বলিল, না দিলেও তো হইবে না; একজনকে দিতেই তো হইবে, মেয়েছেলে হওয়া মিছা।

ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মনে ভারি কষ্ট হইতে লাগিল, আমি একবারে অবাক্ হইয়া থাকিলাম। পরে আমি বাটীতে গিয়া মাকে বলিলাম, মা! আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দিবে? মা বলিলেন, যাট! তোমাকে কাহাকে দিব, এ কথা তোমাকে কে বলিয়াছে, কোথা শুনিলে, তোমাকে কেমন করিয়াই বা দিব। এই বলিয়া আমার মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে গেলেন। আমি দেখিলাম, আমার মা কাঁদিতেছেন। অমনি আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, তখন আমি নিশ্চয়ই জানিলাম, আমাকে একজনকে দিবেন। তখন আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি হইল, আমার মা আমাকে কোথা রাখিবেন।

ঐ কথা আমার মনের মধ্যে এত যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমার মন একেবারে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, আর কিছুই ভাল লাগে না, আমি কাহারও সঙ্গে কথাও কহি না, আর কোন কাজও করি না,

আমার খাইতেও ইচ্ছা হয় না, দিবা রাত্রি আমার কেবল কান্না আইসে। আমি ঐ কথা মনে ভাবিয়া সর্ব্বদা মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। আর সকল সময়ই আমার চক্ষে জল পড়িত। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর এককালে শুকাইয়া গেল, এ সকল কথা আমার মনের মধ্যে থাকিত, ইহা আর কেহ জানিত না, কেবল পরমেশ্বর জানিতেন। আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম সকল লোকেই বলিত যে, সকলেরি বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি, তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; বিবাহ হয় এই মাত্র জানি। তখন সকল লোক আমাকে বলিতে লাগিল, তোমার বিবাহ হইবে। আমাকে যত্ন করিতে কেহ কখন ত্রুটি করেন নাই, তথাপি বিবাহ হইবে বলিয়া আরো যত্ন এবং স্নেহ করিতে লাগিলেন।

তখন আমার মনে বেশ আহ্লাদ উপস্থিত হইল; বিবাহ হইবে, বাজনা আসিবে, সকলে হুলু দিবে, দেখিব। আবার ভয়ের সহিত কত প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহা বলা যায় না। এই প্রকার হইতে হইতে ক্রমে দিন দিন ঐ ব্যাপারের জিনিস-পত্র সমুদয়ের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমেই সকল কুটুম্ব স্বজন বাটীতে আসিতে লাগিল। ঐ সকল দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহি না, সকল দিবস কাঁদিয়াই কালযাপন করি। সকল লোক আমাকে কোলে লইয়া কত সান্ত্বনা করেন, তথাপি আমার মনের মধ্যে যে কি কষ্ট রহিয়াছে তাহা কিছুতেই যায় না।

পরে ক্রমেই আমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস অলঙ্কার, লাল সাড়ী, বাজনা প্রভৃতি দেখিয়া আমার ভারি আহ্লাদ হইল। তখন আর আমার সে সকল মনে নাই। আমি হাসিয়া হাসিয়া সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। ঐ ব্যাপার সমাপন হইয়া গেলে পর দিবস প্রাতে সকল লোকে আমার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওরা কি আজি যাবে? তখন আমি ভাবিলাম, ঐ যাহারা আসিয়াছে তাহারাই যাইবে, পরে আমাদের বাহির বাটীতে নানা প্রকার বাজনার ধুমধাম আরম্ভ হইল।

তখন ভাবিলাম, ঐ যাহারা আসিয়াছিল, এখন বুঝি তাহারাই যাইতেছে। এই ভাবিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলাম। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ঐ সকল লোক বাটীর মধ্যে আসিয়া জুটিল। দেখিলাম কতক লোক আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কতক লোক কাঁদিতেছে। উহা দেখিয়াই আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। ক্রমে আমার দাদা, খুড়া, পিসী এবং মা প্রভৃতি সকলেই আমাকে কোলে লইয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঐ সকলের কান্না দেখিয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। ঐ সময় আমি নিশ্চয় জানিলাম যে মা এখনি আমাকে দিবেন। তখন আমি আমার মার কোলে গিয়া মাকে আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলাম, আর মাকে বলিলাম, মা! তুমি আমাকে দিও না। আমার ঐ কথা শুনিয়া ও এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া ঐ স্থানের সকল লোক কাঁদিতে লাগিলেন এবং সকলে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া অনেক মতে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, মা আমার লক্ষ্মী, তুমিতো বেশ বুঝ, ভয় কি, আমাদের পরমেশ্বর আছেন, কেঁদ না, আবার এই কয়েক দিবস পরেই তোমাকে আনিব। সকলে শ্বশুর বাটীতে যায়, কেহতো তোমার মত কাঁদে না, তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলে কেন? স্থির হইয়া কথা বল, তখন আমার এত ভয় হইয়াছে যে, ভয়ে আমার শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, আমার এমন হইয়াছে যে, মুখে কথা বলিতে পারি না। তথাপি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, মা! পরমেশ্বর কি আমার সঙ্গে যাবেন? মা বলিলেন, হাঁ যাবেন বৈ কি, তিনি সঙ্গেই যাবেন, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন; তুমি আর কাঁদিও না। এই প্রকার বলিয়া অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমার ভয় এবং কান্না কিছুতে নিবৃত্তি হইল না। ক্রমেই আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তখন অনেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমকে আনিলেন। ঐ সময় আমার কি ভয়ানক কষ্ট হইল! সে কথা মনে পড়িলে এখনও দুঃখ হয়। বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদিগের অধীনতা

স্বীকার, আপনার মাতাপিতা কেহ নহেন—এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়! কিন্তু ইহা ঈশ্বরাধীন কর্ম্ম, এইজন্য ইহা প্রশংসার যোগ্য বটে।

আমাকে যে কোলে লইতে লাগিল, আমি তাহাকেই দুই হাতে ধরিয়া থাকিতে লাগিলাম, আর কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে দেখিয়া আবালবৃদ্ধ সকলে কাঁদিতে লাগিল, এই প্রকারে সকলে আমাকে অনেক যত্নে আনিয়া দ্বিতীয় পাল্কীতে না দিয়া ঐ এক পাল্কীর মধ্যেই উঠাইয়া দিলেন। আমাকে পাল্কীর মধ্যে দিবামাত্রই বেহারারা লইয়া চলিল; আমার নিকট আমার আত্মবন্ধু কেহই ছিল না, আমি এককালে বিপদ সাগরে পড়িলাম, আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া মনের মধ্যে এই মাত্র বলিতে লাগিলাম, পরমেশ্বর! তুমি আমার কাছে থাক। মনে মনে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার মনের ভাব কি বিষম হইয়াছিল! যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। আমি আমার পরিবারগণকে না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আর মনের মধ্যে একান্তমনে কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম, আমার মা বলিয়াছেন, তোমার ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও।

ঐ কথা মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, এই প্রকার কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গলা শুকাইয়া গেল এবং ক্রন্দন-শক্তিও রহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ রচনা

ওহে প্রভু বিশ্বেশ্বর, বিশ্বব্যাপী বিশ্বম্ভর,
বিশ্বের ঈশ্বর বিশ্বময়।
জননীর কোল ত্যজি, অতিশয় দুঃখে মজি,
তোমারে ডাকি হে পেয়ে ভয়॥
বন্ধুগণ অদর্শনে, অধৈর্য্য হয়েছি মনে,
আশঙ্কায় কাঁপিছে হৃদয়।
কেঁদেছি জননী বোলে, আপনি নিয়াছ কোলে,
জননী হইয়া সে সময়।
তখন ব্যাকুল মনে, ভক্তিভাবে প্রাণপণে,
তোমারে ডেকেছি অবিশ্রাম।
অয়ি এসে কোলে করি, নিবারি নয়নবারি,
পূর্ণ করিয়াছ মনস্কাম॥
সঙ্গে সঙ্গে আছ সদা, পড়িলে বিপদে কদা,
হস্ত ধরি করেছ উদ্ধার।
অতুল করুণা তব, ভুলিয়া আছি সে সব,
ধিক্ ধিক্ জীবন আমার॥

আর কাঁদিতে পারি না। ইতিমধ্যে ঘোরতর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম। পরে কোথা গিয়াছি, তাহার কিছুই জানি না।

পর দিবস প্রাতে জাগিয়া দেখিলাম, আমি এক নৌকার উপরে রহিয়াছি। আমার নিকট আমার আত্মীয়বর্গ কেহই নাই, আর যত লোক দেখিতে লাগিলাম ও যত লোকের কথা শুনিতে লাগিলাম, তাহার মধ্যে একজন লোকও আমি চিনি না এবং কাহাকেও কখন দেখি নাই। তখন আমি কাঁদিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, আমার মা কোথা রহিলেন, আমার পরিবারগণ বা কোথায় রহিল, গ্রামের প্রতিবাসিনীগণ যাঁহারা আমাকে বিস্তর স্নেহ করিতেন, তাঁহারা কোথা গেলেন, আমার খেলার সঙ্গিনীগণ বা কোথা রহিল, আমি বা কোথা যাইতেছি। এই ভাবিয়া আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ

হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার কান্না দেখিয়া ঐ নৌকার সকল লোক আমাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল। উহাদের সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া, আমার বাটীর সকলের স্নেহের কথা মনে পড়িয়া, আমার মনের খেদ যেন উথলিয়া উঠিল। আমার চক্ষের জল একবারে শতধারে পড়িতে লাগিল, কিছুতেই রক্ষা হয় না। কাঁদিতে কাঁদিতে আমার প্রাণ শ্বাসগত হইল, আর কাঁদিতেও পারি না। আমি কখনও নৌকাতে চড়ি নাই, আমার এজন্য ঘুরও লাগিল। তখন আমি এ-সকলের আশায় নিরাশ হইয়া মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে কেবল একমাত্র ভয়। কিন্তু মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও। সেই নামটি জপ করিতে লাগিলাম।

আহা! আমি যে তখন কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা কেবল সেই বিপদভঞ্জনই জানেন, অন্য কেহ জানে না।

এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী, জালে বন্দী মীন॥

সে যাহা হউক, পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ, আমার আক্ষেপ করা নিরর্থক। বিশেষতঃ আমার পূর্ব্বের মনের ভাব কি প্রকার ছিল, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। আর সকল মেয়ের মনে কি প্রকার হয়, জানি না, বোধ হয়, এত কষ্ট তাহাদিগের না হইলেও না হইতে পারে। মনের কষ্টের কারণতো কিছুই দেখা যায় না, তথাপি নিজ পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া আমার চক্ষের জল অহরহঃ ঝরিত!

লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই। কয়েক দিবস নৌকার উপরে থাকা হইল। এক দিবস শুনিতে লাগিলাম, নৌকার সকল লোক বলিতে লাগিল, আজি আমরা বাটী যাইব। তখন আমার মনে একবার উদয় হইল, বুঝি আমাদের বাটীতেই যাইব, আবার ভয়ের সহিত কত প্রকার ভাবনা হইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। এই প্রকারে যে কি ভাবনা হইতে লাগিল, তাহা পরমেশ্বরই জানেন, মুখে

বলা বাহুল্য। তখন কেবল কান্নাটিই আমার সম্বল হইল, দিবারাত্র কান্নাতেই কালযাপন হইত।

আহা! জগদীশ্বর! তোমার কি আশ্চর্য্য ঘটনা। তোমার নিয়মের শত শত ধন্যবাদ দিই। আত্মাধিক জননী এবং স্নেহপূর্ণ পরিবারগণ এ সকলকে ত্যাগ করাইয়া কোথা হইতে কোথায় আনিয়াছ। সেই দিবস রাত্রে নৌকা হইতে ঐ বাটীতে গিয়া দেখিতে লাগিলাম, কত প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইতেছে, কত প্রকার লোক দেখিতে লাগিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার মধ্যে একজন লোকও আমাদের দেশের নয়, কাহাকেও আমি চিনি না, এজন্য আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমার এমন হইল যে, একচক্ষে শতধারে জল পড়িতে লাগিল। সকলে আমাকে সান্ত্বনা করিতে ল্যাগিলেন, কাঁদিও না, এই ঘর, এই সংসার, এই সকল লোকজন যা কিছু আছে সকলি তোমার। এখন এই বাটীতেই থাকিতে হইবে, এই সংসারই করিতে হইবে, কি জন্য কাঁদ, আর কাঁদিও না। সে সময় সেই সান্ত্বনাবাক্যে প্রাণাধিক প্রিয়তম পিতৃগৃহের পরিবারদিগের আশায় নিরাশ হইয়া আমার মন এক-কালে শোকানলে দগ্ধীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা এ সকল বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাঁহারা বোধ হয় এ প্রকার বাক্য বলিয়া সান্ত্বনা করেন না। যেমন একজনের সন্তান বিয়োগ হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে সান্ত্বনা করেন যে, ছি ছি! তুমি কাহার জন্য কাঁদ, ও যে তোমার কত জন্মের শত্রু ছিল, সে তোমার ছেলে ছিল না, তাহা হইলে এমন করিয়া যাইত না। এমন ডাকাতের নাম কি আর মুখে আনিতে আছে?

এইরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করিলে কি সান্ত্বনা হয়? কখনই নহে। এরূপ ব্যাকুলতার সময়ে এ প্রকার সান্ত্বনাতে মন কদাপিও শান্ত হইতে পারে না। কেবল জ্বলন্ত অগ্নির উপরে তৃণরাশি দিলে আরো জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ সকল সান্ত্বনা বাক্যে শোকসাগর উথলিয়া উঠে। ঐ সকল সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ আতঙ্কে উড়িয়া গেল। তখন আমার কোন সাধ্যই নাই, কোন উপায় নাই। কেবল

মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি। আর দুই চক্ষে বারিধারা ঝরিতেছে। তখন আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে কোলে লইয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, আহা! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। একি অপূর্ব্ব ঘটনা! কৌশলের বালাই লইয়া মরি। কোন্ গাছের বাকল কোন্ গাছে লাগিল।

তাঁহার সেই কোল যেন আমার মায়ের কোলের মত বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেরূপ স্নেহের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি আমারি মা। অথচ তিনি আমার মায়ের আকৃতি নহেন। আমার মা বড় সুন্দরী ছিলেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী শ্যামবর্ণা; এবং আমার মা'র সহিত অন্য সাদৃশ্যও ছিল না। তথাপি তিনি কোলে লইলে আমি মা জ্ঞান করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতাম। আমার কান্না এবং ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমার বাপের বাটীতে সকলে আমাকে যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন, এখানে তাহার অধিক স্নেহ ও যত্ন হইতে লাগিল। আমাকে এক তিলও মাটিতে নামান হইত না, সকল দিবস আমাকে কোলেই রাখা হইত। তথাপি আমার এত ভয় ছিল, দিবারাত্রি ভয়ে আমার কলেবর কম্পিত হইত। সর্ব্বদা আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। আর আমি মনে মনে অহরহঃ কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতামঃ হে করুণাময় পিতা পরমেশ্বর! জানিলাম তোমার অসীম করুণা। তখন যে আমি তোমাকে অহরহঃ ডাকিয়া মনে রাখিতাম, সে কেবল আমার ভয়ের জন্য মাত্র। তোমার নাম যে এত গুণবিশিষ্ট, তাহা আমি জানিতাম না। আমার মা বলিয়াছিলেন, ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও। আমি সেইজন্য প্রাণপণে তোমাকে ডাকিতাম। যা হউক, আমি যে তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়াই সর্ব্বদা একান্ত মনে তোমাকে ডাকিতাম, সেও তোমারি কৃপা মাত্র।

যে তোমারে ডাকে নাথ পড়িয়া সঙ্কটে।
জেনেছি তাহারে দয়া কর অকপটে॥

প্রথম বার যাওয়াতেই আমার তিন মাস থাকা হয়, ঐ তিন মাস আমি মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় দিবারাত্রি কান্নাতেই কালযাপন

করিয়াছিলাম। পরে তিন মাস অতীত হইলে আমার খুড়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তখন আমি আমার মায়ের কোলে বসিয়া মা! আমাকে পরকে দিয়াছিলে কেন?—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া সকল লোক হাসিতে লাগিল। আমার মা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, দেখ, যাহারা তোমার ছোট, তাহারাতো তোমার মত কাঁদে না, সকলেই শ্বশুরবাটী গিয়া থাকে। তোমার আর কত দিনে বুদ্ধি হইবে, কত দিনেই বা পরমেশ্বর সদয় হইয়া তোমাকে ভাল বুদ্ধি দিবেন? তুমি না জানি কতই বা কাঁদিয়াছিলে! মা আমাকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমার সকল আত্মীয়-বন্ধু আসিয়া আমাকে ঘিরিল। তখন আমি আমার আত্ম-বন্ধুবান্ধবকে এবং খেলার সঙ্গিনী সকলকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলাম, আর ও সকল দুঃখের কথা কিছু মনে থাকিল না। সকল ভুলিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। সেই দিন যে কি আনন্দের দিন, সে আনন্দ বর্ণনাতীত; তখন যেমন অল্পেই কান্না উপস্থিত হইত, পরমেশ্বর তেমনি আনন্দও দিয়াছিলেন। আমি ঐ সকলের সঙ্গ পাইয়া আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যা হউক, বাল্যকালের পর আর কাল নাই, তখন আমার বয়ঃক্রম বার বৎসর। এই বার বৎসর অবধি আমার এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থাতে গত হইয়াছে। তখনও আমি পাঁচ বৎসরের মেয়ের মত ব্যবহার করিতাম। ছি ছি! আমি এমন ছিলাম যে আমার বুদ্ধিমাত্রও ছিল না, এইজন্য সকলে আমাকে নির্ব্বোধ বলিত। বিবাহের পরে আমার খুড়া আমাকে এক বৎসর শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। ঐ এক বৎসর আমি মার কাছে সচ্ছন্দচিত্তে কালযাপন করিয়াছিলাম। এক বৎসর পরে আবার আমায় যাইতে হইল। সেই বার গিয়া দুই বৎসর থাকা হইল। আমি পূর্ব্বের মতই সকল দিবস কাঁদিতাম, কিন্তু ঐ বাটীর লোকজন ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে আমি অল্প অল্প চিনিতে লাগিলাম, আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতাম না; কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। পরমেশ্বরের সঙ্গেই যা কিছু কথা হইত। আর আমার বাপের বাড়ীর সকলের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া কাঁদিতাম।

আমার চক্ষে জল ছাড়া হইত না ! পক্ষীটা, কি গাছটা, কি কুকুরটা, কি বিড়ালটা যা দেখিতাম, আমার জ্ঞান হইত যে, আমার বাপের দেশ হইতে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া কাঁদিতাম। পিত্রালয়ে আমার অতিশয় সোহাগ ছিল। লোকে মেয়েকে কত গালি দেয় এবং মায়ে কত মারিয়াও থাকে ; মারা দূরে থাকুক, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে কেহ বড় করিয়া কথাও বলে নাই, ফলতঃ আমার বড় সোহাগ ছিল। পরে নূতন জায়গায় গিয়া নূতন বৌ হইলাম, এখানেও আমার আদরের ক্রটি হয় নাই ; বৌ হইয়া আমার সোহাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার খেলার জন্য কত প্রকার জিনিস আনিয়া আনিয়া দিতেন। আর ঐ গ্রামের সকল বালিকাদিগকে ডাকিয়া আমার নিকট আনিয়া দিতেন। ঐ বালিকাগণ খেলা করিত, আমি বসিয়া দেখিতাম ; ঐ প্রকারে কতক দিবস গত হইয়াছে। তখনও আমি গোপনে গোপনে কাঁদিতাম বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকল দিন থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের পোষা পাখী হইয়া তাঁহাদেরি শরণাগত হইলাম। বাল্যকালের সকল কথাই আমার যেন ছাইমাটির মত বোধ হয়, যাহা হউক আমিতো লিখিয়া বসিলাম।

হে পিতা দয়াময় ! তুমিতো নিকটেই আছ, এবং মনেই আছ, তবে কেন মনে নানা প্রকার বৈকল্য উপস্থিত হয়, বুঝিতে পারি না।

যেখানে পিতা দয়াময়,
সেখানে আবার কিসের ভয়।
যেখানে আছ তুমি পিতা,
সেখানে আবার ভয়ে ভীতা।
যেখানে তোমার নাম সম্বল,
সেখানে কিসের অমঙ্গল।
যেখানে তোমার নামের ধ্বনি,
সেখানে কি ভূত পেতিনী।
যেখানে তোমার নামামৃত,
সেখানে সব হয় অমৃত।

ঐ বাটীতে নয় জন চাকরাণী ছিল, তাহার মধ্যে ঘরের কাজ করা চাকরাণী এক জন, আর আট জন বাহিরের লোক, তাহারা বাহিরে কাজ করিত। আমায় কোন কাজ করিতে হইত না। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী পাক করিতেন, আমাকে কিছু কাজ করিতে দিতেন না। আমি সকল দিবস বসিয়া থাকিতাম। ঐ গ্রামের বালিকাগণ আমার নিকটে সকল দিবস থাকিত। ঐ বাটীর চাকরাণীগণ এবং ঐ সকল বালিকা সকল দিবস আমাকে লইয়া আমোদ করিত, এবং খেলাও করিত। আমি সকল সময় একত্রে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগের সঙ্গে আমার ভারি প্রণয় হইল। আমার পিত্রালয়ে যেমত বালিকাগণের সঙ্গে প্রণয় ছিল, ইহাদের সঙ্গেও তেমনি প্রণয় হইল। তখন আমি পূর্ব্বের মত তত কাঁদিতাম না, তথাপি কান্না ছিল; কিন্তু কিছু কম পড়িল। আমাকে কেহ কোন কাজ করিতে দিতেন না, আমি সকল দিবস নিরর্থক বসিয়া থাকিতাম, আর মনে মনে ভাবিতাম, আমি কি কাজ করিব। সংসারের সমুদয় কাজতো চাকরাণীতেই করে, ঘরের কাজে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আছেন, তাঁর উপরে চাকরাণীও আছে। তখন মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শিখাইত না। আমি কি কাজ করিব, কিছুই পাই না। এখনকার মত পয়সা তখন ছিল না, সে সময় কেবল কড়ি ছিল, ঐ কড়িতেই সকল কারবার চলিত; আমি ঐ কড়ি আনিয়া নানাবিধ জিনিস তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলাম। ঝাড়, পদ্ম, আরসী, ছত্র, আলনা, ছিকা এই সকল বানাইয়া ঘরে লটকাইয়া রাখিতাম।

আর পাতর কাটিয়া ক্ষীরের ছাঁচ করার জন্য সঞ্চ বানাইতাম; পাট দিয়া ছিকা বানাইতাম; মাটি দিয়া পুতুল, ঠাকুর, মুছি, সাপ, বাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, মানুষ, গরু এবং পক্ষী ইত্যাদি যা দেখিতাম তাহাই বানাইতাম। এক দিবস মাটির এক সাপ বানাইয়া তাহার গায়ে রং দিয়া সাজাইয়া ঘরের মধ্যে খাটের নীচে রাখিয়াছিলাম, সে সাপ বানাইতে কেহ দেখে নাই। পরে ঐ সাপ দেখিয়া একজন লোক গিয়া বাহির বাটীর কাছারীর সকল লোককে ডাকিয়া আনিল। মাটির সাপ দেখিয়া সত্য জ্ঞান করিয়া মারিতে চেষ্টা করিল। কেহ বা লাঠী হাতে, কেহ বা সড়কি লইয়া ঘরের আড়ার উপর উঠিল, কেহ বা

দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিল ; আমি ইহার কিছুই জানি না ! আমি যদি জানিতাম তাহা হইলে বলিতাম, ও মাটির সাপ ; এত লোক যে নিরর্থক পরিশ্রম করিতেছে, তাহা আমি জানি না। ঐ মাটির সাপ দেখিয়া সকলে ভারি ভয় পাইয়াছে। বাস্তবিক সে সাপ বড় মন্দ হয় নাই, দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। ঐ সাপ যেন ফণা তুলিয়া গর্জ্জিতেছে। দেখিয়া ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না। একজন আড়ার উপরে থাকিয়া সাপকে যেমন দণ্ডাঘাত করিবে, অমনি সেই মাটির সাপ ভাঙ্গিয়া গেল। আর সকল লোক হাসিয়া গোল করিতে লাগিল ! আর আমি শুনিলাম, ঐ মাটির সাপ লইয়া সকলে গোল করিতেছে। এজন্য আমি ভারি লজ্জিত হইলাম। সেই অবধি আমি আর কিছু বানাইতাম না। কিন্তু মনের মধ্যে বোধ হইত, কেবল মিছা আমোদে কালহরণ হইতেছে। ইহাতে কিছুই ফল নাই, সময় মিথ্যা নষ্ট হইতেছে।

এত দিবস আমার এই অবস্থায় গত হইল। পরে অল্প দিবস মধ্যেই আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী সান্নিপাতিকের পীড়ায় দৃষ্টিহীন হইলেন, আর কোন কাজ করিতে পারেন না। তখন তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় কাজ পর্য্যন্ত আমাকে করিতে হইত। অধিকন্তু ঐ সংসারের সমুদয় কাজের ভারও আমার উপর পড়িল। তখন আমার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম, এখানে আসা পর্য্যন্ত আমাকে কোন কাজ করিতে দেন নাই। বিশেষতঃ ঐ সংসারটি বড় কম নহে, দস্তুর মতই আছে। বাটীতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতে অন্নব্যঞ্জন ভোগ হয়। বাটীতে অতিথি, পথিক সতত আসিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্য হইতে সিধাপত্র দেওয়া হয়। এদিকে রান্নাও বড় কম নহে। আমার দেবর ভাশুর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু চাকর চাকরাণী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন বাটীর মধ্যে ভাত খাইত, তাহাদিগকে ছুবেলাই পাক করিয়া দিতে হইত। বিশেষতঃ ঠাকুরাণী চক্ষুহীন হইয়াছেন, তাঁহার সেবাও সর্ব্বোপরি। অধিকন্তু ঘরের কাজের জন্য একটি লোকমাত্র ছিল, তখন সে লোকও ছিল না। ঘরের মধ্যে আমি একমাত্র হইলাম। আমি ব্যাকুলচিত্তে ঐ সকল কাজের তরঙ্গ

দেখিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম। আমা হইতে এত কাজ হওয়ার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। আমি মনে মনে এই চিন্তাটি অধিক করিতে লাগিলাম। হে দীননাথ! আমার শক্তিতে যে এসকল কাজ সুসম্পন্ন হয়, এমন ভরসাও করি না। তবে যদি হয়, সে তোমার নিজ গুণে, তুমি যা কর তাই হবে। আমি এই প্রকার পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া ঐ সমুদয় কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল কাজ আমার পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছায় এমন সহজ হইল যে, আমি একাই দুবেলা পাক করিতে পারগ হইলাম, এবং সমুদয় কাজ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সে-কালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহারও সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে-কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না। এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্ম্মের রীতি ছিল। আমি ঐ রীতিমতেই চলিতাম।

শিখিবার জন্যই দেখিতেছে। কিন্তু আমি মনের সহিত সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। হে দীননাথ! তখন যে তোমাকে আমি ডাকিতাম, সে এই উপলক্ষে মাত্র। আর মনে মনে বলিতাম, পরমেশ্বর! তুমি আমাকে কোথা হইতে কোথা আনিয়াছ। আমার জন্মভূমি পোতাজিয়া গ্রাম, আর এই তিন দিবসের পথ রামদিয়া। তুমি আমার আত্মীয় বন্ধু সকল ত্যাগ করাইয়া এত দূরে আনিয়াছ। এখন এই রামদিয়া গ্রামই আমার বাস্তুভূমি, কি আশ্চর্য্য! আমি যখন কোন কাজ করিতে জানিতাম না, তখন এক-আধখানি কাজ যদি করিতাম, আমার মা সেই কাজ দেখিয়াই কত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। সেই কাজের কথা বলিয়া বলিয়া কত আহ্লাদ করিতেন। এখন আমি পরাধীন হইয়া এত কাজ শিখিয়াছি যে, আমি এত লোকের কাজ করিতে পারি। এখন এই সকল লোক আমার অন্তরঙ্গ হইয়াছে, আমি মনে মনে এই সকল কথা বলিয়া কাঁদিতাম। সে কান্না অন্য কেহ জানিত না! আমি ঘোমটার ভিতরে কাঁদিতাম, তাহা আর কে জানিবে! দীননাথ কেবল তুমি জানিয়াছ। হে পিতা পরমেশ্বর! হে মনের মন! হে জীবনের জীবন! হে দয়ার সাগর দয়ানিধি! তোমার দয়ার স্রোতে অহোরাত্র ভাসিতেছি। তুমি আমার বিপদ্ সম্পদে সকল সময়েই সঙ্গে সঙ্গে আছ, আমার মনে যখন যে ভাব হইয়াছে, তাহা সকলি তুমি জান, তোমার অগোচর কিছুই নাই।

আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি। আর এই পর্যন্ত সেই রামদিয়াতেই আছি। কিন্তু এই বাটীর সমুদয় লোক বড় সজ্জন ছিলেন, আমাকে ভারি স্নেহ করিতেন, এমন কি, যদি আমার কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত, তাঁহাদের স্নেহগুণে সে যন্ত্রণা আমার যন্ত্রণাই বোধ হইত না।

ঐ বাটীর চাকর-চাকরাণী এবং গ্রামের প্রতিবাসিনী প্রভৃতি সকল লোক আমাকে এত স্নেহ করিত যে, আমার নিশ্চয় বোধ হইত, যেন পরমেশ্বর ইহাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। আমার মনে আর একটি

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেন ঐ গ্রামের লোক তাঁহাদিগের নিজ পরিবার অপেক্ষাও আমাকে স্নেহ করেন। বাস্তবিক আমার প্রতি কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ দেশের সমুদয় লোকই বড় সজ্জন। আমি এতকাল ঐ দেশে বাস করিতেছি এবং এখন পর্যন্তও আছি। (ইহার মধ্যে আমার পরিবারের তো কথাই নাই) ঐ দেশের সকল লোক আমার প্রতি অকপট স্নেহ করিয়া থাকেন। মনের ভ্রমেও কেহ কখন আমাকে কটুবাক্যে বলেন নাই। এখন পর্য্যন্তও সেই ভাবটি আছে, পরে কি হয় বলা যায় না। এখানে আমায় আর কত দিবস থাকিতে হইবে। শেষ দশাতে আমার কি প্রকার অবস্থা ঘটিবে, এবং সেই সকল লোকেরা আমার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিবেন, জানি না; তাহা পরমেশ্বর জানেন।

হে প্রভু! বিশ্বময়! বিশ্বপিতা! তোমার অসীম মহিমা, তুমি কখন কি কর, কে জানিতে পারে, তোমার কথা তুমি জান। এবিষয়ে আমাদের চিন্তা করাই ভ্রম। আমি বার বৎসরের সময় রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি। আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নূতন বৌ ছিলাম। মনের ভাবটিও ছেলেমি মতই ছিল। এই আঠার বৎসর আমার এই অবস্থায় কালগত হইয়াছে। কিন্তু এই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনটি বড় বেশ ছিল। সাংসারিক বিষয় চিন্তার কোন কারণ ছিল না, কেবল সর্ব্বদা গৃহকার্য্য করিব, আর কোন্ কর্ম্ম করিলে লোকে ভাল বলিবে, কি প্রকারে সকলের মন সন্তুষ্ট থাকিবে, এই চেষ্টাটি ছিল। কিন্তু এইটি ভারি আক্ষেপের বিষয় ছিল যে, মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না। এখনকার মেয়েছেলেদিগের কি সুন্দর কপাল! এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এ মত ভালই বলিতে হইবেক।

এক্ষণে আমার যে কয়েকটি সন্তান হয়, তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। আমার বয়ঃক্রম যখন ১৮ বৎসর, তখন আমার একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম বিপিনবিহারী। যখন আমার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম পুলিনবিহারী। আমার ২৩ বৎসরের সময় আর একটি কন্যাসন্তান

হয়, তাহার নাম রামসুন্দরী। ২৫ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম প্যারীলাল। ২৮ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম রাধানাথ। যখন আমি ৩০ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম দ্বারকানাথ। যখন আমি ৩২ বৎসরের, তখন আমার আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম চন্দ্রনাথ। আমি যখন ৩৪ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম কিশোরীলাল। তাহার পরে আর একটি পুত্রসন্তান ছয় মাস গর্ভবাস করিয়াই গত হয়। পরে যখন আমি ৩৭ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম প্রতাপচন্দ্র। তাহার পর যখন আমি ৩৯ বৎসরের, তখন আর একটি কন্যাসন্তান হয়, তাহার নাম শ্যামসুন্দরী। পরে আমি যখন ৪১ বৎসরের, তখন আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটি জন্মে, তাহার নাম মুকুন্দলাল। ১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তানটি হয়, আর ৪১ বৎসরে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না। ঐ বাটীতে আটজন চাকরাণী ছিল, তাহারা বাহিরের লোক। সে সময় ঘরের কাজের লোক ছিল না। ঘরের মধ্যে আমি একা মাত্র ছিলাম। আমি পূর্ব্বের ঐ নিয়ম মত সংসারের সমুদয় কাজ করিতাম! অধিকন্তু ঐ কয়েকটি সন্তান পালন করিতে হয়। এই সকল কাজের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না; কাজের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না। এমনি কাজের ভিড় ছিল। যাহা হউক, সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। বলিলেও লজ্জা বোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য। তথাপি সংক্ষেপে দুই এক দিবসের কথা বলা আবশ্যক বটে। আমি ঐ ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ঐ ছেলে কয়েকটি না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ান হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ-সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া, আমাদের ঘরের রান্নার সকল

আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্তও কম নহে। এক সন্ধ্যা দশ বার সের চাউল পাক করিতে হইত। এ দিকে বাটীর কর্ত্তাটির স্নান হইলেই ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। এজন্য অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।

একদিন এই সকল খাওয়া দাওয়া মিটাইয়া আমি যখন ভাত লইয়া খাইতে বসিব, ঐ সময়ে একজন লোক আসিয়া অতিথি হইল। সে লোকটি জাতিতে নমঃশূদ্র, সে পাক করিয়া খাইতে চাহিল না, এবং অন্যান্য সামগ্রী কিছু খাইতেও স্বীকার করিল না। সে বলিল, চাট্টি ভাত পাইলে খাই। আমি যে তাহাকে পাক করিয়া দিব, সে সময়ও নাই। আর কি করিব, আমার ঐ যে মুখের ভাতগুলি ছিল, সেই ভাত-গুলি ঐ অতিথিকে ধরিয়া দিলাম। আমি ভাবিলাম, রাত্রিতে পাক করিলে খাওয়া যাইবেক। পরে বৈকালে যে সকল কাজ করিতে হয়, তাহা একমত সারিয়া ছেলেদিগকে ঘুম পাড়াইয়া পাক করিতে চলিলাম। কিন্তু ঐ সময় আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। আমি ঘরের মধ্যে একা, আর অন্য লোক নাই। ঘরের খাবার দ্রব্য নানাপ্রকার আছে। তাহা আমি খেলেও খেতে পারি, কে বারণ করে। বরং আমাকে খাইতে দেখিলে ঘরের লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু আমি ভাত ছাড়া অন্য জিনিস আপনি লইয়া কখনও খাইতাম না। এই জন্য আমার অনেক খাদ্য খাওয়ার বাদ হইয়া গিয়াছিল। আর আমি বিবেচনা করিলাম, আজ আমার খাওয়া হয় নাই শুনিলে সকলে গোল করিবে। বিশেষতঃ মায়ে খেতে বসিলে ছেলেপিলে আসিয়া ভারি গোলযোগ করিবে, তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হইবে এবং কাজের অনেক হানি হইবে। আর সে লেঠা করিয়া কাজ নাই, এই ভাবিয়া পাক করিতে চলিলাম। তখন পাক করিয়া অনেক রাত্রি বসিয়া থাকিলাম। বাহির বাটীর কাচারী আর ভাঙ্গে না, কর্ত্তাও বাটীর মধ্যে আইসেন না। তখন আমি অন্যান্য সকল লোককে ভাত দিয়া এক প্রকার কাজ মিটাইয়া কর্ত্তার ভাত লইয়া বসিয়া থাকিলাম, আর মনে

মনে ভাবিতে লাগিলাম, কর্ত্তা এতক্ষণ পর্য্যন্ত আইলেন না, ইহার পরে ছেলেরা জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমার আজি আর খাওয়া হইবেক না। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনাটি সিদ্ধ হইল। কর্ত্তাও বাটীর মধ্যে আসিলেন, ছেলে একটি জাগিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি কর্ত্তার সম্মুখে ভাত দিয়া ঐ ছেলেটিকে আনিলাম। মনে করিলাম, কর্ত্তার খাওয়া হইতে হইতে ছেলেটির ঘুম আসিবে। না হয় কোলে লইয়াই খাওয়া যাইবেক। তাঁহার খাওয়া হইতে না হইতেই আর একটি ছেলে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন মনে করিলাম, এ তুজনাকে লইয়াই খাওয়া যাইবে, এই বলিয়া সে ছেলেটিও আনিলাম। আমি ঐ তুই ছেলে লইয়াই ভাত খাইতে বসিলাম। ইতিমধ্যে দৈবাৎ ঝড় বৃষ্টি আসিল। তখন ঐ ঘরের দীপটাও নিভিয়া গেল। তখন অন্ধকার দেখিয়া ঐ তুই ছেলে কাঁদিতে লাগিল। আমার এত ক্ষুধা হইয়াছিল যে, আমি যদি ঐ ঘরে একা থাকিতাম, তাহা হইলে ঐ অন্ধকারেই ভাত খাইতাম। যে সকল চাকরাণী আছে তাহারা বাহিরের লোক। রাত্রিকালে ছেলে তুটিকে কিছু অন্ধকারেও বাহিরে রাখা হয় না। বিশেষ ছেলে তুটি কাঁদিলে কর্ত্তাটি, কাঁদে কেন কাঁদে কেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সোর করিবেন। তদপেক্ষা আমার না খাওয়াই ভাল। তখন কাজে কাজেই ঐ ভাত ঐখানে রাখিয়া অন্য ঘরে যাইতে হইল। পরে ঝড় বৃষ্টি কম হইলে ঐ ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, আমারও অতিশয় আলস্য হইল, সুতরাং সে দিবস আর খাওয়া হইল না। পর দিবস ঐ নিয়মে সকল কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া পাক করিতে চলিলাম। আমার যে কল্য খাওয়া মোটেই হয় নাই তাহা কেহ জানে না। আমি সকল লোকের খাওয়া হইয়া গেলে পর খাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কোলের ছেলেটিকে একটি লোকে রাখিয়াছে। তখন তাহাকেও খাইতে দিতে হয়, ছেলেটিকেও তুধ; খাওয়াইতে হয় সুতরাং ঐ ছেলেটিকে ভাত দিয়া ছেলে কোলে লইয়া আমি ভাত খাইতে বসিলাম। বসা মাত্রেই ছেলেটি কোলের মধ্যে হাগিয়া দিল। তখন ঐ ছেলে কোলে থাকিয়া ঐ ভাতের উপর এত প্রস্রাব করিল যে, সমুদয় ভাত এককালে ভাসিয়া চলিল।

পরমেশ্বরের ঐ কাণ্ড দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। আমি যে দুই দিবস ভাত খাই নাই, একথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না, আমার মনে মনেই থাকিল। বিশেষতঃ আপনার খাওয়ার কথা সকল লোকে শুনিবে, সেটি ভারি লজ্জার বিষয়। ও সকল কথা আমি কাহারও নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না। এই প্রকারে মাঝে মাঝে কত দিবস আমার খাওয়া হইত না। পরমেশ্বরের কৃপায় আমার শরীরে রোগ-পীড়া বড় ছিল না। আমি যদি চিররোগী হইতাম, তাহা হইলে আমার এই কয়েকটি সন্তান প্রতিপালিত হওয়া কঠিন হইত। হে জগদীশ্বর! তোমার অসীম মহিমার কে সীমা নিরূপণ করিবে! এই অধিনী কন্যার প্রতি তোমার কত দয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভাবিলে মন এককালে অধৈর্য্য ও অবশ হইয়া পড়ে। তোমার এ অজ্ঞান সন্তান তোমার মাহাত্ম্য কিছুই জানে না। তবে যে এ 'অধীনা কায়মনোবাক্যে তখন তোমাকে ডাকিত সে কেবল জননীর অনুমতি ক্রমে মাত্র। এজন্য আমার জন্ম ধন্য, আমার জীবন ধন্য, আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থ বোধ করি।

হে পিতা করুণাময়! আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তোমাকে চিনি না। তুমি যদি আমার সঙ্গে না থাকিতে, আর আমার এই শরীর রোগাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তবে আমার সন্তান পালন করা দূরে থাকুক, আমি আপনার শরীর লইয়া কি যে করিতাম বলিতে পারি না, আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইত। অতএব তোমাকে শত শত ধন্যবাদ! হে দীননাথ! একটি সন্তান পালন করিতে মায়ের যে কত প্রকার যাতনা আর কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা তোমার প্রসাদে আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি। ছেলের জন্য মায়ের যে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। নিজের উপরে চাপ না পড়িলে লোকে বিশেষ মতে জানিতে পারে না। ফলতঃ সন্তানের জন্য মায়ের যে কত দূর পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেটি আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। মনুষ্য মাত্রেরই এ বিষয় ভালমতে জানা আবশ্যক। প্রায় লোকে এ সকল বিষয় জ্ঞাত নহেন। এমন যে স্নেহময়ী আমার মা, আমি তাঁহার সেবা করি নাই, এই কথাটি আমার মনে ভারী আক্ষেপের

বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জননী যে এমন দুর্ল্লভ বস্তু, আমি তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলাম না। আমার জন্য আমার মার এত কষ্ট হইয়াছিল! আমি মায়ের কোন কর্ম্মে লাগি নাই। আমা হইতে আমার মায়ের কিছু উপকারই হয় নাই। আমার মা আমাকে দেখিবার জন্য কত রোদন করিতেন এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই বা কত যত্ন করিতেন। আমি এখানে আসিয়া অবধি দায়মালী কারাগারে বন্দী হইয়াছি। এই সংসারের কাজ চলিবে না বলিয়া প্রাণান্তেও আমাকে পাঠান হইত না। তবে যদি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আমার যাওয়া হইত, কিন্তু কয়েদী আসামীর মত দুই চারি দিন মধ্যে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইত। আমার সঙ্গে দশ পনর জন লোক, দুই জন সরদার, দুই জন দাসী এক নৌকার সহিত বসিয়া থাকিত। আমি যে করারে যাইতাম, ঐ করার মতেই আসিতে হইত। ক্রিয়া-কলাপ ভিন্ন আমার যাওয়া কোনমতেই ঘটিত না। আমার মা মৃত্যুকালে আমাকে দেখিবার জন্য কত প্রকার খেদ করিয়াছিলেন। আহা! আমি এমন অধমা পাপীয়সী, মায়ের মৃত্যুকালেও তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছি! আমি মাকে দেখিবার জন্য কত প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টহেতু কোন ক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এটি কি আমার সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! হা বিধাতঃ! তুমি কেনই বা আমাকে মানবকুলে সৃষ্টি করিয়াছিলে? পৃথিবী মধ্যে পশু পক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্য-জন্ম দুর্ল্লভ বটে। সেই দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহা পাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবনে ধিক্! পৃথিবী মধ্যে মাতার তুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়। এমন যে দুর্ল্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গী।

ষষ্ঠ রচনা

জন্মিয়া ভারত ভূমে, মজিয়া মোহের ঘুমে,
হেলায় হারাই চিরদিন।
না পাই উপায় তার, কোথা প্রভু বিশ্বাধার,
দয়া কর আমি হে সুদীন॥
তুমি প্রভু বিশ্বময়, তোমাতে প্রলয় লয়,
শুদ্ধ তত্ত্ব কে জানে তোমার।
কি করিব বরণন, পঞ্চমুখে পঞ্চানন,
অনন্ত না পান অন্ত যাঁর॥
আগম নিগম যত, কোরাণ পুরাণ কত,
করে তব তত্ত্ব নিরূপণ।
কিন্তু কি জানিবে তারা, তোমার কৌশল ধারা,
শুদ্ধ তত্ত্ব জানে কোন জন॥
চরাচর ত্রিসংসারে, কে তোমা জানিতে পারে,
তুমি নাহি জানালে আপনি।
আমি কোন্ শক্তি ধরি, তোমাকে জানিতে পারি,
তাহে ছার অবলা রমণী॥
সত্তারূপে অহরহ, সর্ব্বস্থলে তুমি রহ,
এই মনে ভরসা আমার।
দিয়াছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
জানা যাবে মহিমা তোমার॥

তখন ঐ সংসার সমুদ্রে কাজে মগ্ন থাকাতে আমার দিবারাত্র কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে, তাহা আমি কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। অনন্তর আমার মনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি একান্ত লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। তখন আমি মনে মনে মনের উপর রাগ করিতে লাগিলাম। কি জ্বালা হইল, কোন মেয়ে লেখা-পড়া শিখে না, আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব, একি দায় উপস্থিত হইল। আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার-ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই

বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলা নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক। এ বিষয়ে অন্যের প্রতি অনুযোগ করা নিরর্থক, আমাদের নিজের অদৃষ্ট ক্রমেই এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরাণীরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, অতএব আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব। আমার মনও তাহা মানে না, লেখাপড়া শিখিব বলিয়া সতত ব্যাকুল থাকে। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যখন আমি ছেলেবেলায় স্কুলে বসিয়া থাকিতাম, তখন যত ছাত্র লেখাপড়া করিত, আমিতো তাহা শুনিতে শুনিতে কতক কতক মনে মনে শিখিয়াছিলাম, তাহার কিছুই কি আমার স্মরণ নাই? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ঐ চৌত্রিশ অক্ষর, ফলা বানান সহিত আমার মনে হইল। তাহাও কেবল পড়িতে পারি, লিখিতে পারি না। কি করিব, ভাবিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ একজন না শিখাইলে, কেহ লেখাপড়া শিখিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি মেয়ে, তাহাতে আবার বউ মানুষ, কাহার সঙ্গে কথা কহি না, অধিকন্তু আমাকে যদি কেহ দুটা কটু বাক্য বলে, তাহা হইলে আমি মৃতপ্রায় হইব; এই ভয়ে আমি কাহার নিকটও কথা কহিতাম না। কেবল দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি নিতান্তই শিখিব। তুমি যদি না শিখাও, তবে আর কে শিখাইবে। এইরূপে মনে মনে সর্ব্বদা বলিতাম। এই প্রকারে কতক দিবস যায়।

এক দিবস আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছি,—আমি যেন চৈতন্য-ভাগবত পুস্তকখানি খুলিয়া পাঠ করিতেছি। আমি এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন আমার শরীর মন এককালে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি জাগিয়াও চোক বুজিয়া বার বার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম, আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম। এই প্রকার আহ্লাদে আমার শরীর মন পরিতুষ্ট হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য্য!

এ চৈতন্যভাগবত পুস্তক আমি কখনও দেখি নাই এবং আমি ইহা চিনিও না ; তথাপি স্বপ্নাবেশে সেই পুস্তক আমি পাঠ করিলাম। আমি মোটে কিছুই লিখিতে পড়িতে জানি না, তাহাতে ইহা ভারী পুস্তক। এ পুস্তক যে আমি পড়িব, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। যাহা হউক, আমি যে স্বপ্নে এ পুস্তক পড়িলাম, ইহাতে আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমার জীবন সফল হইল। আমি পরমেশ্বরের নিকটে সমস্ত দিনই বলিয়া থাকি, আমাকে লেখাপড়া শিখাও, পুঁথি পড়িব। সেইজন্য পরমেশ্বর লেখাপড়া না শিখাইয়াই স্বপ্নে পুঁথি পড়িতে ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা আমার বড় আহ্লাদের বিষয়, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার জন্ম ধন্য, পরমেশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ভাবিয়া ভারি প্রফুল্লচিত্তে থাকিলাম।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, শুনিয়াছি, এই বাটীতে অনেক পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে চৈতন্যভাগবত পুস্তকও থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু থাকা না থাকা আমার পক্ষে সমান কথা। আমি কিছু লেখাপড়া জানি না, সুতরাং পুঁথি চিনিতে পারিব না, এই ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ ! আমি কল্য স্বপ্নে যে পুস্তকখানি পড়িয়াছি, তুমি ঐ পুস্তকখানি আমাকে চিনাইয়া দাও। ঐ চৈতন্য-ভাগবত পুস্তকখানি আমাকে দিতেই হইবে, তুমি না দিলে আর কাহাকে বলিব। আমি এই প্রকার মনে মনে বলিতেছি, আর পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি।

আহা কি আশ্চর্য্য ! দয়াময়ের কি অপরূপ দয়ার প্রভাব ! আমি যেমন মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছিলাম, অমনি তিনি শুনিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তখন আমার বড় ছেলেটি আট বৎসর বয়স্ক। আমি পাকের ঘরে পাক করিতেছি, ইতিমধ্যে কর্ত্তা আসিয়া ঐ ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন ! আমার চৈতন্য-ভাগবত পুস্তকখানি এখানে থাকিল, আমি যখন তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও। এই বলিয়া ঐ চৈতন্য-ভাগবত পুস্তকখানি ওখানে রাখিয়া, তিনি বাহির বাটীতে গেলেন।

আমি পাকের ঘরে থাকিয়া ঐ কথাটি শুনিলাম। তখন আমার

মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা বলা যায় না। আমি অতিশয় পুলকিত মনে তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম, সেই চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি বিদ্যমান। আমি ভারি সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, পরমেশ্বর! তুমি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছ। এই বলিয়া আমি ঐ পুস্তক খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বেশ করিয়া দেখিলাম। এখানকার পুস্তক সকল যে প্রকার, সে কালে এ প্রকার পুস্তক ছিল না। সে সকল পুস্তকে কাঠের আড়িয়া লাগান থাকিত। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র ছবি আঁকাইয়া রাখিত। আমিতো লিখিতে পড়িতে জানি না, কিরূপে ঐ পুস্তক চিনিব? আমি কেবল ঐ চিত্র পুত্তলিকা দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিলাম।

পরে পুস্তকখানি ঘরের মধ্যে রাখিলে আমি ঐ পুস্তক খুলিয়া একটি পাত লুকাইয়া রাখিলাম। সে পাতটি কোথা রাখিব, কেহ দেখিবে বলিয়া ভারি ভয় হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই পুস্তকের পাত যদি আমার হাতে কেহ দেখে, তাহা হইলে নিন্দার একশেষ হইবেক। অধিকন্তু কটুবাক্য বলিলেও বলার সম্ভব আছে। লোকের নিকট নিন্দিত কর্ম্ম করা, কিম্বা কটুবাক্য সহ্য করা বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। এ সকল বিষয়ে আমার ভারি আশঙ্কা। বিশেষতঃ সে সময়ে এখনকার মত আচার ব্যবহার ছিল না। সে এক কাল গিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে পরাধীনতায় কাল যাপন হইত। বিশেষতঃ আমার অতিশয় ভয় ছিল। তখন ঐ পুস্তকের পাতটি লইয়া আমি মুস্কিলে পড়িলাম। হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিব, কোথায় রাখিব, কোথায় থুইলে কে দেখিবে। এ প্রকার ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, যে স্থানে থাকিলে আমি সতত দেখিতে পাইব অথচ অন্য কেহ না দেখে, এমন স্থানে রাখা উচিত। আর কোথা রাখিব, রান্না ঘরের হেঁসেলের মধ্যে খোড়ীর নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। কি করিব, সকল দিবস সংসারের কাজে অবকাশ পাওয়া যায় না। সেই পাতাটি যে কখন দেখিব, তাহার সময় নাই। রাত্রে পাক সাক করাতেই ভারি রাত্রি হইয়া পড়ে। তখন ঐ সকল কাজ মিটিতে না মিটিতেই ছেলেপিলেগুলি জাগিয়া উঠিয়া বসে। তখন কি আর অন্য

কোন কথা! তখন কেহ বলে মা মুতিব, কেহ বলে মা ক্ষিদে লেগেছে, কেহ বলে মা কোলে নে, কেহ বা জাগিয়া কান্না আরম্ভ করে। তখনতো ঐ সকলকে সান্ত্বনা করিতে হয়। ইহার পরে রাত্রিও অধিক হয়, নিদ্রা আসিয়া চাপে, তখন লেখাপড়া করিবার আর সময় থাকে না। কি প্রকারে আমি শিখিব তাহার কোন উপায় দেখি না। লেখাপড়া একজন না শিখাইলে কেহ শিখিতে পারে না। আমি যে দুই চারিটা অক্ষর মনে মনে পড়িতে পারি, তাহাও লিখিতে জানি না। লিখিতে না জানিলে জিতাক্ষর হওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং ঐ লেখা পাতটি আমি কেমন করিয়া পড়িব? আমি ভাবিয়া কোন উপায় দেখি না। অধিকন্তু কেহ দেখিবে বলিয়া সর্ব্বদাই ভয়।

আমি এককালে নিরুপায় হইয়া একান্ত মনে কেবল দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, হে পরমেশ্বর! আমি এই পুস্তক যাহাতে পড়িতে পারি, আমাকে এরূপ কিঞ্চিৎ লিখিতে শিখাও, তুমি যদি না শিখাও, তবে আর কে শিখাইবে! আমি এই প্রকার পরমেশ্বরের নিকটে দিবারাত্র প্রার্থনা করিতাম। আর একবার মনে ভাবিতাম, লেখাপড়া আমার শিখা হইবে না। যদিও চেষ্টা করিলে এবং কেহ শিখাইলে এক আধটি বিষয় শিখা যায়, তাহারও সময় পাওয়া যায় না। আমার কিছু হবে না, মিথ্যা বাসনা মাত্র। আবার মনে মনে বলি, কেন হবে না, পরমেশ্বর যখন আমার মনে এতখানি আশা দিয়াছেন, তখন তিনি কখনই নিরাশা করিবেন না। আমি এই প্রকার সাহস করিয়া ঐ পাতটি রাখিলাম। কিন্তু দেখিতে সময় পাই না। যখন পাক করি, ঐ সময়ে সেই পুস্তকের পাতটি বাঁ হাতের মধ্যে রাখি, আর এক একবার ঘোমটার মধ্যে লইয়া দেখি। দেখিলেই বা কি হইতে পারে, আমি মোটে কোন অক্ষর চিনিতে পারি না।

তখন আমার বড় ছেলেটি তালপাতে লিখিত। আমি তাহার একটি তালের পাতাও লুকাইয়া রাখিলাম। ঐ তাল পাতটি একবার দেখি, আবার ঐ পুস্তকের পাতটিও দেখি, আর আমার মনের অক্ষরের সঙ্গে যোগ করিয়া দেখি, আবার সকল লোকের কথার সঙ্গে যোগ করিয়া মিলাইয়া মিলাইয়া দেখি। এই প্রকার করিয়াই কতক দিবস

গত হইল, সেই পুস্তকের পাতটি একবার বাহির করিয়া দেখিতাম, আবার কেহ দেখিবে বলিয়া অমনি খোড়ীর নীচে লুকাইয়া রাখিতাম।

আহা কি আক্ষেপের বিষয়! মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দ্দশা! চোরের মত যেন বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলিয়া কি বিদ্যা শিক্ষাতেও দোষ? সে যাহা হউক, এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়। এই লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট হইয়াছে। আমি যে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি, সে কেবল সম্পূর্ণ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মাত্র।

আমি যে লোকের অধীনী হইয়া একাল পর্যন্ত দিবস গত করিয়াছি বাস্তবিক তিনি বেশ লোক ছিলেন। কিন্তু দেশাচার ত্যাগ করা ভারি কঠিন ব্যাপার। এ জন্যই আমার এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, গত কর্ম্মের আর শোচনা কি? সেকালে মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারি মন্দ কর্ম্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল। তখনকার কেন, এখনও কতক লোক এরূপ দেখা যায়, যেন বিদ্যা তাহাদিগের শত্রু। লেখাপড়ার নাম শুনিয়া অমনি জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের বলিলে কি হইবে। সময় অমূল্য ধন; সে কাল আর এই কাল, দুই সময়ের তুলনা করিয়া দেখিলে, তদপেক্ষা এখন যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সকল বিষয় এখন যে প্রকার হইয়াছে, সে কালের লোক এখন দেখিলে তাহাদের আর বাঁচিতে হইত না; দুঃখে আর ঘৃণাতেই মরিত। বস্তুতঃ পরমেশ্বর যখন যেরূপ আচার-ব্যবহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তাহা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সেকালের লোকের সেই মোটা মোটা কাপড়, ভারী ভারী গহনা, হাতপোরা শাঁকা, কপালভরা সিঁদুর বড় বেশ দেখাইত। আমাদের সকল পরিচ্ছদ যদিও সে প্রকার ছিল না, তথাপি যাহা ছিল তাহাই মনে হইলে ঘৃণা বোধ হয়।

যাহা হউক, পরমেশ্বর আমাকে এত দিবস অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন আমি বড় সন্তুষ্ট মনে এতকাল যাপন করিয়াছি। এখন আর অধিক বলিব কি, পরমেশ্বর যা করেন সেই ভাল। আমি যে ছেলেবেলা

স্কুলে বসিয়া থাকিতাম, তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। আমি সেই পুস্তকের পাতটি ও ঐ তালের পাতটি লইয়া মনের অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতাম। আমি এই প্রকার করিয়া সকল দিবস মনে মনে পড়িতাম। আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি গোঙ্গাইয়া পড়িতে শিখিলাম। সেকালে এমন ছাপার অক্ষর ছিল না। সে সকল হাতের লেখার অক্ষর পড়িতে ভারি কষ্ট হইত। আমার এত দুঃখের পড়া। বস্তুতঃ আমি এত কষ্ট করিয়া পড়িতে শিখিয়াও তাহা লিখিতে শিখিলাম না। বিশেষতঃ লিখিতে বসিলে তাহার অনেক আয়োজন লাগে, কাগজ, কলম, কালি, দোয়াত চাহি। তাহা লইয়া ঘটা করিয়া সাজাইয়া বসিতে হয়। আমি একেতো মেয়ে, তাহাতে বউ মানুষ, মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শিখিতেই নাই। এটি স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রধান দোষ বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে স্থলে আমি এ প্রকার সাজিয়া লিখিতে বসিলে লোকে আমাকে দেখিয়া কি বলিবে। বাস্তবিক আমাকে কেহ কটুবাক্য বলিবে বলিয়া আমার অত্যন্ত ভয় ছিল। এইজন্য আমি লেখার বিষয় ক্ষান্ত দিয়া গোপনে গোপনে কেবল পড়িতাম। আমি যে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে পারিব, সে কথাটি আমার চিত্তের অগোচর। বিশেষতঃ এমন অবস্থায় লেখা-পড়া হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তবে যে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি, সে যেন পরমেশ্বর নিজে আমার হাত ধরিয়া শিখাইয়াছেন, এই মত আমার জ্ঞান হইত। আমি যে একটুক পড়িতে পারিতাম, তাহাতেই আমার মন মগ্ন হইয়া থাকিত, আর লেখার কথা মনেও করিতাম না।

সপ্তম রচনা

কোথা রৈলে দীননাথ ওহে দয়াময়।
হের দুঃখিনীর দুঃখ হইয়া সদয়॥
করুণাসাগর পিতা করুণানিধান।
এ দুঃখ সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ॥
বিষয় বিষেতে মোর জেগেছে হৃদয়।
তোমারে ভুলিয়া আছি কি হবে উপায়॥
অনাথ নিতান্ত আমি কে করে সান্ত্বনা।
তোমা বিনা কে জানিবে মনের যন্ত্রণা॥
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার।
জানিতে পারি না কিসে হব ভব পার॥
দেখিতেছি তব দয়া অসীম অতুল।
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কূল॥
কিন্তু হায় যখন ভাবিয়া দেখি চিতে।
জানি না সরল মনে তোমারে ডাকিতে॥
তখন হৃদয়ে হ'য়ে চিন্তাই প্রবল।
আমারে করে হে নাথ নিতান্ত বিহ্বল॥
অকূল সমুদ্র হেরি বিষাদিত মন।
রক্ষা কর এ বিপদে বিপদভঞ্জন॥
থাকিতে তুমি গো পিতা ডাকিব কাহারে।
কাহারি বা সাধ্য আছে রক্ষা করিবারে॥
দয়াময় নাম তব দয়ার সাগর।
তবে কেন দুঃখে এত হয়েছি কাতর॥
বলবুদ্ধিহীন আমি না সরে বচন।
তরঙ্গে তরণী হয়ে দেহ দরশন॥
সহে না সহে না নাথ বিলম্ব সহে না।
রাসসুন্দরীর দুঃখ হেরি প্রকাশ করুণা॥

হে পিতঃ! রাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর! আমি এমন রাজার কন্যা হইয়া কেনই বা দুঃখিনী হইব। রাজার মেয়ে দুঃখিনী এ কথা কি

সম্ভব হয় ? কিন্তু পিতঃ ! মাতাপিতা নিকটে না থাকাতে মাতৃহীন সন্তান যেমন মনোদুঃখে থাকে, আমিও তোমার অদর্শনে অহরহঃ তেমনি দুঃখে ভাসিতেছি।

এই প্রকারে আমি চিন্তা করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি, তখন আমার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। এই পঁচিশ বৎসর আমার এই প্রকার অবস্থাতে গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমার পূর্ব্বের বাল্য অবস্থা সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমার শরীর বাল্যভাব পরিবর্ত্তন করিয়া যৌবনবেশ ধারণ করিয়াছে, এবং মনও বাল্য অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া বিষয়কর্ম্মে আবিষ্ট হইয়াছে। আহা মরি ! একি অপূর্ব্ব কাণ্ড ! আমার বাল্যচিহ্ন কিছুই নাই।

এই অবস্থায় কিছু দিন যায়, ইতিমধ্যে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু হইলে ঘর একেবারে শূন্য হইল, ঘরে আমি একলা হইলাম। তখন ঐ সংসারের গৃহিণীর কর্ম্মের ভার আমার উপর পড়িল। আমিও ভারি বিপদে পড়িলাম। তখন আমার চারিটি সন্তান হইয়াছে, আবার ঐ সংসারের গৃহিণীর কর্ম্মের ভারটিও স্কন্ধে পড়িল। পূর্ব্বের অবস্থা আর কিছু থাকিল না, সে সময় সমুদয় নূতন হইল। আমার নূতন বৌ নামটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল। কেহ বলিত মা, কেহ বলিত মা ঠাকুরাণী, কেহ বলিত বউ, কেহ বলিত বউ ঠাকুরাণী, কেহ বলিত বাবুর মা, কেহ বলিত কর্ত্তা মা, কেহ বলিত কর্ত্তা ঠাকুরাণী। এই প্রকার অনেক নূতন নূতন নাম হইল। আমার পূর্ব্বের বাল্যচিহ্ন আর কিছুই নাই। এককালে বাল্যভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আমি একজন পুরাতন মানুষ হইলাম। পূর্ব্বে আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব যে প্রকার ছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি যেন এখন সে আমি নই, আমি যেন ভিন্ন আর একজন হইয়াছি। আমার মনের দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া কত বল এবং কত সাহস প্রাপ্তি হইল। আমার পুত্র কন্যা, দাস দাসী, প্রজা লোক ইত্যাদি নানা প্রকার সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি এখন আচ্ছা একজন গৃহস্থ হইয়াছি, এ আবার কি কাণ্ড ! এখন অধিকাংশ

লোকে আমাকে বলে কর্ত্তা ঠাকুরাণী। দেখা যাউক, আরও কি হয়।

আমার তিনটি ননদ ছিলেন, তখন তাঁহারা বিধবা হইয়া আমার নিকটেই আসিলেন। তাঁহারা আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন, এবং অতিশয় যত্ন করিতেন। আমিও তাঁহাদিগকে বিগ্রহতুল্য সেবা করিতাম, তাঁহারা সম্পর্কে আমার ছোট ননদ ছিলেন, তথাপি আমার এত ভয় ছিল যে, আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকট সশঙ্কচিত্তে যোড়করে থাকিতাম ; তাঁহারাও আমাকে প্রাণতুল্য স্নেহ করিতেন। বাস্তবিক ননদে যে ভাইজকে এত স্নেহ করে, এ প্রকার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমার চারি পাঁচটি সন্তান হইয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত আমি সেই ননদদিগের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতাম না। ঐ সংসারের গৃহিণীর সমুদয় কাজ আমার করিতে হইত, কিন্তু আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। তাঁহারা সকল বিষয়ে বেশ উত্তম লোক ছিলেন।

আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া এই শ্বশুরবাটীতে আসিয়াছি। আর আমার বয়ঃক্রম যখন পঁচিশ বৎসর, তখন আমার মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ছেলেমি ভাবটি কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তখন তাহা বড় একটা প্রকাশ পাইত না। আমি যখন আট নয় বৎসরের ছিলাম, তখন আমাকে কত লোক পরিহাস করিয়া বলিত, তোমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমার বুদ্ধি এমনি ছিল, আমি সেই কথায় বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন আমার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনও সেই বুদ্ধির শিকড় কিছু কিছু ছিল, কিন্তু লোকে বড় প্রকাশ পাইত না, গুপ্তভাবে থাকিত।

ঐ বাটীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ! আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে,

কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। তখন সকলে বার বার বলিতে লাগিল, বাহিরে আসিয়া দেখ, ভয় কি ? আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়াই ভয়ে ভয়ে একটুক দেখিলাম।

ঐ বাটীর আঙ্গিনাতে রাশি রাশি ধান ঢালা থাকে। ঐ জয়হরি ঘোড়া প্রত্যহ আসিয়া ঐ ধান খাইত ; পাছে ঐ ঘোড়া আমাকে দেখে, এই ভয়ে আমি যদি বাহিরে থাকিতাম, তবে তাহাকে দেখিবামাত্র ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইতাম। এই প্রকারে কত দিবস যায়, এক দিবস আমি পাকের ঘরে ছেলেদিগকে খাইতে দিয়া অন্য ঘরে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে ঐ জয়হরি ঘোড়া আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। ছেলেদিগকে খাইতে দিয়াছি, তাহারাও মা মা ডাকিতে লাগিল, কেহ বা কাঁদিতে লাগিল। ঘোড়াও ধান খাইতে লাগিল, যায় না। আমি ভারি বিপদে পড়িয়া আগুয়ান পাছুয়ান করিতে লাগিলাম। কি করি কর্ত্তার ঘোড়া, পাছে আমাকে দেখে, এই ভাবিয়া ঐখানেই থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলেটি আসিয়া বলিল, মা, ও ঘোড়া কিছু বলিবে না, ও আমাদের জয়হরি ঘোড়া, ভয় নাই। তখন আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম, ছি ছি আমি কি মানুষ ! আমিতো ঘোড়া দেখিয়া ভয় করি না, আমি যে লজ্জা করিয়া পলাইয়া থাকি। এতো মানুষ নহে, এ যে ঘোড়া, ও আমাকে দেখিলে ক্ষতি কি ! এই সকল কথা যদি অন্য কেহ শুনিতে পায়, তবে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। এ কথা আমি লজ্জায় আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু সেই দিবস হইতে আমি আর ঘোড়া দেখিয়া পলাইতাম না। সে কথা সকলে জানিলে বোধ হয় আমাকে কত বিদ্রূপ করিয়া হাসিত। বাস্তবিক আমার অতিশয় ভয় ছিল। এখনকার ছেলেপিলেরা এত ভয় করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বুড়া মানুষে ভয় করিয়া থাকে। সে যাহা

হউক, আমার নিজের বুদ্ধির দশা দেখিয়া মনে ধিক্কার জন্মে। আমার কর্ম্ম দেখিয়া অন্য লোকেতো হাসিতেই পারে, আপন কথা মনে হইলে আপনারি হাসি আইসে।

তখন পর্য্যন্তও আমি পূর্ব্বের মত বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া কাজ করিতাম; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, এখনও নূতন বউ হইয়া থাকিলে কোনমতে সংসারের কাজ চলিবে না। কাজের অনেক রকমে ক্ষতি হইবে। তখন ঐ সকল চাকরাণীদিগের দুই একজনের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। আমার ননদদিগের সঙ্গেও স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতাম। আমি ঐ সংসারের সমুদয় কাজ একা করিতাম, আর গোপনে গোপনে বসিয়া চৈতন্যভাগবত পুস্তকও পড়িতাম। তখন যে আমি পুস্তক পড়িতে পারি, তাহা অন্য কেহ জানিত না, কেবল ঐ চাকরাণী কয়েকজন জানিত। আর আমার নিকটে ঐ গ্রামের যে কয়েকজন লোক সতত থাকিত, তাহারাই জানিত। এই প্রকারে কয়েক দিবস গত হইল।

পরে ক্রমে ক্রমে আমার আর কয়েকটি সন্তান হইল, তখন ক্রমেই আমার গৃহিণীর পদটি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, অনেকে সংসারের সুখের জন্য পরমেশ্বরের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে। কিন্তু আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ঐশ্বর্য্যে আমার কোন আকিঞ্চন ছিল না। তথাপি জগদীশ্বর স্বয়ং অনুকূল হইয়া, সংসার ধর্ম্মে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক লাগে, আমাকে তৎসমুদয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন! এ বিষয়ে পরমেশ্বর আমার কোন আক্ষেপ রাখেন নাই। পুত্র কন্যা, দাস দাসী, অনুগত প্রজা লোক, কুটুম্ব স্বজন, মান সম্ভ্রম, আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি সম্পদ লোকের যাহা ঘটিতে পারে, জগদীশ্বরের প্রসাদে আমার তাহা এক প্রকার বড় মন্দ ছিল না।

লোকে বলিয়া থাকে, অনেক সন্তান হইলে তাহার মাতার নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়; সে কথাটি মিথ্যা নহে, যথার্থই বটে। তাহার কারণ এই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, লোকের সকল সন্তান একমত হয় না। কেহ বা মূর্খ, কেহ বা দুশ্চরিত্র, কেহ বা কুরূপ কুৎসিত, কেহ বা নির্ব্বোধ হয়, আর কেহবা পৈতৃক ধনে জলাঞ্জলি দিয়া অসার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া

থাকে। ঐ সকল কর্ম্ম দেখিলে লোকে সহজেই নিন্দা করে। বাস্তবিক তাহা শুনিলে পিতামাতার মনে ভারি কষ্ট উপস্থিত হয়। এমন কি আপনার জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া থাকে। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার অকৃত্রিম স্নেহ, সুতরাং সন্তানের প্রতি যদি কেহ কুৎসিত ব্যবহার করে, কিম্বা তাহার কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহা শুনিলে তাঁহাদের মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ সন্তান হইতে মাতাপিতার যেমন নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, মনুষ্যকে এত যন্ত্রণা আর কিছুতেই ভোগ করিতে হয় না। সন্তান কুসন্তান হইলে তাহার জীবিত অবস্থাতেই যন্ত্রণা, মরিয়া গেলেও যন্ত্রণা। বস্তুতঃ পিতার অপেক্ষা এ বিষয়ে মাতার যন্ত্রণাই বেশী। কিন্তু জগদীশ্বর সদয় হইয়া এ বিষয়ে আমাকে কোন কষ্টই দেন নাই। আমার পুত্রকন্যায় যে কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল, তাহারা সকলেই একমত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সুন্দর, সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, দাতা, দয়াবান্, ধাম্মিক এবং কখনও গর্হিত কর্ম্ম করিত না। ইঁহাদের চরিত্র বিষয়ে আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু দর্প করিয়া বলা উচিত নহে, দর্পহারী ভগবান আছেন, সকলি করিতে পারেন। কখন কার অদৃষ্টে কি ঘটিয়া উঠে, তাহা বলা যায় না।

অতি দর্পে হতঃ লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম॥

অষ্টম রচনা

তুমি জীবনের কান্ত, তুমি আদি তুমি অন্ত,
অন্তরাত্মা জানহ সকল।
মনে যদি থাকে ছল, হাতে হাতে দাও ফল,
ফলদাতা তুমি হে কেবল॥
কে আর আছে এমন, তোমা বিনা অন্য জন,
কে জানিবে মনের বেদনা।
বিশেষ বলিব কত, জানিতেছ তুমি নাথ,
করিও না এতে প্রবঞ্চনা॥

হে নাথ পতিতপাবন! হে দয়াময় দীনবন্ধু! তুমিতো আমার মনেই আছ। আমার মনের মধ্যে যখন যে প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, তোমার অগোচরতো কিছুই নাই। তাহা সকলি তুমি জানিতেছ।

জগতজীবন তুমি জগতের সার।
দোঁহাই দোঁহাই প্রভু দোঁহাই তোমার॥

আমি যদি আপনার নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া, কিছু গোপনে রাখিয়া থাকি, তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। আমার যে কথা স্মরণ না থাকে, তাহা তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও। আমি যে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিব, কিম্বা কথা বলিব, এমন চেষ্টা আমার কখনই নাই। তবে যদি কোন কারণে মনের ভ্রমক্রমে হয়, তাহা তুমি ভাল করিয়া দাও; আমার মন যেন কখনও তোমার নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করে। হে পিতঃ পরমেশ্বর! আমার মনের ভাবটি যখন যেমন হইয়া উঠে, তাহা সকলি তুমি জানিতেছ, অধিক আর কি বলিব।

লিখিতে জানি না আমি গর্দ্দভের প্রায়।
যে কিঞ্চিৎ লিখি নাথ তোমারি কৃপায়॥
যাহা কিছু মুখে বলি যা ভাবি অন্তরে।
সকলি তোমারে প্রভু পাইবার তরে॥

আমার যেমন দশ বারটি সন্তান হইয়াছিল, তেমনি যদি উহাদিগের চরিত্র মন্দ হইত এবং সকলে মন্দ বলিত, তাহা হইলে আমার ভারি কষ্ট

ভোগ করিতে হইত। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার সে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং লোকের মুখে উঁহাদিগের প্রশংসা শুনিয়া এবং সত্য ব্যবহার দেখিয়া, মন আরও প্রফুল্লই হয়। যাহা হউক, আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, যখন যে প্রকার হইয়াছিল, তাহা সমুদয় আমি ব্যক্ত করিয়া বলিব। লোকে বলে সংসার সমুদ্র। সে সমুদ্রই বটে, কিন্তু সংসারের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করিয়া দেখিলে, সংসার তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ বোধ হয় বড় জয়ী হইতে পারে না, সময়ে সময়ে তুল্যই হয়। সে যাহা হউক, সেই সমুদ্র-লহরী মধ্যে পরমেশ্বর আমাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে মহাসুখে রাখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে আমার যদিও অত্যন্ত বিপদ্ ঘটিয়াছিল, তথাপি আমার মনের এত প্রফুল্ল ভাব ছিল যে, ঐ সকল মহাবিপদে আমাকে এককালে অবসন্ন করিতে পারে নাই। সে সামান্য বিপদ নহে, যাহার নাম পুত্র-শোক। সেই শোকসিন্ধু মধ্যে যেন একবার তরঙ্গে পড়িয়া পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিতেছি, এই প্রকার আমার মনের ভাব ছিল। আমার মন সর্ব্বদা প্রায় আনন্দেই পরিপূর্ণ থাকিত। এই ২৮ বৎসর আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব প্রায় একমতই চলিয়াছে। পরে ক্রমে আমার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর হইলে, আমার বড় ছেলে বিপিনের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনা হইল। সে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলা যায় না, আনন্দরসে শরীর একেবারে ঢলঢল হইল। আমি আবার পুত্রবধূর শাশুড়ী হইলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। ঐ সময় আমি প্রাচীন দলে পড়িলাম। আমি ঐ ৪০ বৎসরের বার বৎসর পিত্রালয়ে ছিলাম। পরে পরাধীনা হইয়া ২৮ বৎসর এক প্রকার বউ হইয়াই ছিলাম। এই অবস্থায় আমার ৪০ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। এত দিবস আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব এক প্রকার ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার মনের প্রাচীনতা ভাব উদয় হইতে লাগিল। তখন আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব যে প্রকার ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। যেন সে শরীর সে মনই নয়। আমি মনোমধ্যে ভাবিতে লাগিলাম, আহা! পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল। যদিও তখন এককালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা শরীরের ও

মনের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল! আমি এই সমুদয় শরীরের ও মনের ভাব-ভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। আমার এই মন কি প্রকারে এত গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিল। আমার মন সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত হইত, সে ভয় আমার মনে কে দিয়াছিল, আবার কাহার বল অবলম্বন করিয়াই বা সে প্রবল ভয় পরাস্ত হইল? আর আমি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে রাত্রে আমি একা ঘরের বাহির হইতে পারিতাম না, দুই জন লোক আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। তথাপি আমার মনের ভয় যাইত না। এখনও আমি সেই আছি এবং আমার মনও সেই মন আছে। তবে কেমন করিয়া এত সাহস, এত বল প্রাপ্ত হইলাম? আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই জানিতে পারিলাম না! হায়! এ কি আশ্চর্য্য! এ অভয় দান আমার মনকে কে দিয়াছে। এখন বোধ হয়, রবিসুত-দর্শনেও আমার মন ভয়প্রাপ্ত হয় না, এ সমুদয় কাজ কাহার? আর আমি মনের মধ্যে যখন যাহা বাসনা করি, তাহা আমি কাহার নিকট বলি না, অন্য লোক কেহ সে কথা জানেও না। তথাপি আমার মনের সে বাঞ্ছাটি অনায়াসে পূর্ণ হয়, সেই সেই কর্ম্ম বা আমার কে করে? আর একটি অপরূপ কাণ্ড দেখিতেছি, ইতিমধ্যে আমার ঘর-বাড়ী, সংসার, পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী, রাজ্য-সম্পদ প্রভৃতি নানাপ্রকর ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল, এখন সকল লোক আমাকে বলে কর্ত্তাঠাকুরাণী। এ কর্ত্তাগিরি পদে কে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে? আর কাহার অনুরোধেই বা আমি এ কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। আহা মরি মরি! কি অদ্ভুত কাণ্ড! এই সকল কৌশলের বালাই লইয়া মরি। এই সকল কর্ম্মের মূল যিনি তাঁহাকে কি বলিব, সেই কর্ম্মকারকে শত শত ধন্যবাদ দেই। আহা! করুণাসাগর পিতা কোথা গো! তোমার এ অনাথা কন্যাটিকে একবার দর্শন দিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। জীবন সার্থক হউক।

আমি সংসারে কেন বদ্ধ হইয়াছি। এমন মনোমোহিনী শক্তি দিয়া কে আমার মনকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। না আমার মন আপনি বিষয়ের ঐশ্বর্য্য-লোভে ভুলিয়া রহিয়াছে! আবার বলি না, তাহা কেন হবে, এ যে অন্যায় বলা হইতেছে, একজন কেহ না দিলে মন পাবে

কোথা। যিনি দয়া করিয়া আমাদের সকল দিয়াছেন, তিনি এই সংসারে আমাদিগকে মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমার মনের মধ্যে এই প্রকার সকল তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। এই প্রকার মনে হওয়াতে আমার মন ভারি ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আমার মন তখন পুরাণ, কীর্ত্তন শ্রবণাদির প্রতি ভারি ব্যগ্র হইল। তখনকার সেই এককাল ছিল; সেকালে মেয়েছেলেদিগের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না; নিজের ক্ষমতায় কোন কর্ম্মই করিতে পারা যাইত না, সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হইয়া কালযাপন করিতে হইত। সে যেন এককালে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মত থাকা হইত। তন্মধ্যে আমার মনে আবার কি প্রকার ভাব উদয় হইল, তাহাও কিঞ্চিৎ বলিতে হইল।

মনের যে ভাব দেখি আশ্চর্য্য কেমন।
চাঁদ ধরিবারে ধায় হইয়া বামন॥

আমার মন যেন তখন ষড়্‌ভুজ হইল। দুই হাতে ঐ সংসারের সমুদায় কাজ করিতে চাহে; যেন বাল বৃদ্ধ কেহ কোন মতে অসন্তুষ্ট না হন। আর দুই হাতে ঐ কয়েকটি ছেলে সাপটিয়া বুকের মধ্যে রাখিতে চাহে। অন্য দুই হস্তে আমার মন যেন চাঁদ ধরিতে চাহে। আহা কি আশ্চর্য্য! মনের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার মুখে আর বাক্য সরে না। দেখ! লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্র রহিয়াছে; সেই চন্দ্র কি কখন কেহ হস্তে ধারণ করিতে পারিয়াছে, কখনই নহে। কেবল নিরর্থক বাসনা মাত্রই সার। যেমন ছেলেপিলে চন্দ্র দেখিয়া ধরিতে চাহে এবং ঐ চন্দ্র পাড়িয়া দাও বলিয়া ক্রন্দন করে, তখন "আয় আয় চাঁদ, আমার চাঁদের কপালে চিক্ দিয়ে যা" এই বলিয়া ছেলেপিলেকে ভুলাইয়া রাখা হইয়া থাকে। আমার মনকেও তখন সেই প্রকার ছেলে ভুলানর মত প্রবোধ দিতে হইল। আমার মন তখন সংকীর্ত্তন ও পুরাণাদি শ্রবণের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল; তাহা কোথা শুনিব? আমাদের বাটীতে পুরাণ সংকীর্ত্তন আদি যাহা কিছু হয়, তাহা বাহির আঙ্গিনাতেই হয়, তাহা বাটীর মধ্য হইতে শুনা যায় না। বাহিরের আঙ্গিনা অনেকখানি তফাৎ, আমিও বাটীর মধ্য হইতে

আঙ্গিনার বাহিরে যাই না, কি প্রকারে শুনিব ? আমার মন তাহা কোন মতেই মানে না. মন নিতান্তই বলে আমি পুরাণ শুনিব।

আমি পুস্তক যে একটু একটু পড়িতে পারি, তাহাও পড়িবার সময় পাই না। বিশেষ কেহ দেখিয়া কি বলিবে, এই ভয় অতিশয় হয়। মনও কোন মতে বুঝে না, ভাবিয়াও উপায় দেখি না। কি করিব, মনে মনে এক উপায় স্থির করিলাম। আমার ননদ তিনটি আছেন, তাঁহারা যদি আমাকে পুঁথি পড়িতে দেখেন, তবে আর রক্ষাও নাই। তাঁহাদিগের যে সময়ে আহ্নিক পূজা আহারাদি হয়, ঐ সময় আমি পুঁথি পড়িব ! এই বলিয়া আমার মনকে স্থির করিলাম। পরে আমার নিকট যে সকল প্রতিবাসিনী সতত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিতাম। আমি যতক্ষণ ঐ পুস্তকখানি পড়িতাম, কেহ আসিয়া দেখিবে বলিয়া সেই পথে একজন লোকপ্রহরী রাখা হইত। আমি অতি ছোট ছোট করিয়া পুঁথি পড়িতাম, তথাপি আমার প্রাণ ভয়ে এক একবার চমকে চমকে উঠিত, মনে ভাবিতাম কেহ বুঝি শুনিল। বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল। সকল বিষয়েই বড় ভয় হইত, আমি ভয়েই মরিতাম। কিন্তু যাঁহারা আমার সঙ্গিনী ছিলেন, তাহারা উত্তম লোক ছিলেন। তাঁহাদিগের সহায়ে আমি গোপনে গোপনে গানও করিতাম। এই প্রকার করিয়া অনেক দিবস গত হইয়াছে। বাস্তবিক যে কালের লোক এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের নিকট মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারি মন্দ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিয়া কি টাকা রোজগার করিয়া আনিবে ? এখনকার মেয়েগুলা লেখাপড়া শিখিব বলিয়া পাগল হয়। মেয়েছেলে ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করিবে, রান্না বান্না করিবে, লজ্জা সরম করিবে, আমরা ইহাই জানি। আমাদের কালে আর এত বালাই ছিল না। শুনিতে পাই বলে, লেখাপড়া শিখিলেই ভাল হয়। আমরা যে লেখাপড়া জানি না, তবে আর আমরা মানুষ নই। আমাদের আর দিন গেল না। তাঁহারা এই প্রকার বলিয়া থাকেন। সে সকল লোকের মনের ভাবে বুঝা যায়,

যেন বিদ্যার আর কোন গুণ নাই, বিদ্যায় কেবল টাকা উপার্জ্জন হয়। ঐ সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইত, কিন্তু পুঁথি পড়া আমি ছাড়িতাম না, গোপনে গোপনে বসিয়া পড়িতাম। এই মতেই কতক দিবস যায়।

পরে ঐ তিনটি ননদের সঙ্গে আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম, তাহাতে তাঁহারা ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেশ মিল হইল। তখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, আমি পুঁথি পড়িতে পারি। তাহা শুনিয়া ভারি আহ্লাদিত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, আহা! তুমি লেখাপড়া জান, ইহা আমরা এত দিবস কিছুই জানি না। এই বলিয়া তাঁহারা দুই ভগিনীতে আমার নিকটে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমার সেই দুটি ননদ অল্প দিন লেখাপড়া করিয়াই ক্ষান্ত দিলেন, শিখিতে পারিলেন না। তখন ঐ পুস্তক পড়ার জন্য আমার সেই ননদেরা আমাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। সেই অবধি আমি আর গোপনে পুঁথি পড়িতাম না। আমার ননদদিগের সম্মুখে সদর হইয়া পুঁথি পড়িতে লাগিলাম। তখন আমার মনে আনন্দের আর সীমা থাকিল না। আহা কি আহ্লাদের বিষয়! আমার বহু দিবসের বাঞ্ছা জগদীশ্বর পূর্ণ করিলেন। আমি প্রতিবাসিনী সমজুটীদের সঙ্গে কখন কখন গোপনে গোপনে গানও করিতাম। সংসারের কাজ আমার নিকট তৃণবৎ বোধ হইত। আমি মনের আনন্দেই প্রায় সকল দিবস থাকিতাম। এই সকল আহ্লাদে আমার মন সততই মগ্ন থাকিত। বিষয়ের দুঃখের ধার বড় ধারিতাম না। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় প্রেমানন্দেই পরিতুষ্ট ছিলাম।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সংসারের বিষয়ে অনেক লোকেরি প্রায় দুঃখের ভার বহন করিতে হয়, কিন্তু আমার যদিও কোন বিষয়ে কষ্ট ছিল না, তথাপি অনেক যন্ত্রণা আমার অন্তরে বাহিরে বিলক্ষণ লাগিয়া রহিয়াছিল। হে জগদীশ্বর! এমন যে দুঃসহ যন্ত্রণা পুত্রশোক ইহা যেন আর মনুষ্যের হয় না। আমার দশটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এই বারটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যে কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা আমি বিশেষ করিয়া বলি। মধ্যম পুত্র পুলিন-

বিহারীর অন্নপ্রাশনের সময় মৃত্যু হয়। পরে প্যারীলাল নামক আর একটি পুত্র একুশ বৎসরের হইয়াছিল। সে ছেলেটি বহরমপুর কলেজে পড়িত। সেই বহরমপুর জেলাতেই তাহার মৃত্যু হয়। রাধানাথ নামে একটি পুত্র ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আর একটি পুত্রের ৩ বৎসরের সময়েই মৃত্যু হয়, তাহার নাম চন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ পুত্রটির ৪ বৎসরে সময়ে মৃত্যু হয়, তাহার নাম মুকুন্দলাল। আমার বড় কন্যাটির ১৭ বৎসর বয়সে একটি পুত্রসন্তান জন্মে, ১৩ দিবস পরে সূতিকা ঘরেই তাহার মৃত্যু হয়। ঐ সূতিকা ঘরেই তাহার ছেলেটিরও মৃত্যু হয়। আমার একটি পুত্র গর্ভবাসে ছমাস থাকিয়া গত হইয়াছে। আমার বড় পুত্র বিপিনবিহারীর দুটি পুত্রসন্তান হয়, তিন বৎসর এবং ৪ বৎসরের হইয়া সে দুটি সন্তানই মরিয়াছে।

আমি যদি এই সকলের মৃত্যুর কথা একবার মনে করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমার শোক বড় অল্প হয় না, শোকসাগর উথলিয়া উঠে। আমার পৌত্র, দৌহিত্র এবং ছয়টি পুত্র, আর একটি কন্যা, এই সমুদয় পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট এখন আমার চারিটি পুত্র, আর একটি কন্যা, এই মাত্র। পরে যে কি হইবে, তাহা পরমেশ্বরই জানেন! সংসারী লোকের প্রতি পরমেশ্বর সম্পদ্ বিপদ্ দুই-ই সমান করিয়া দিয়াছেন। কেহ বা কষ্টের কথাটি আগ্রহ করিয়া মনে রাখিয়া সতত কষ্ট ভোগ করিতেছে। কোন লোক এমনও দেখা যায়, তাঁহাদিগের শত শত বিপদের রাশি সম্মুখে থাকিলেও তাঁহারা সেদিকে দৃষ্টিপাতও করেন না।

সে যাহা হউক, লোকে বলে অস্ত্রের প্রহার আর পুত্রশোক এ দুইটিই সমান কথা। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অস্ত্রের প্রহার ও পুত্রশোক কখন সমান হইতে পারে না। অস্ত্রাঘাত মনুষ্যের শরীরে যদি অধিক পরিমাণে হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে। আর যদি কিছু অল্প পরিমাণে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত শরীরে অস্ত্রের ঘা থাকে, সেই পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ ঘা যখন শুকাইয়া যায়, তখন আর শরীরে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না।

কিন্তু শোকাঘাত যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত থাকে। যদিও অনেক কষ্টে বাহিরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া অন্যমনা হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলেও শোকানল প্রবল বেগে অহরহঃ হৃদয় দগ্ধ করে। শোকে লোকের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। শোকে লোক জ্ঞানহারা হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়া যায়। শোকে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, আর কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা বলা যায় না। শোক হইলে লোক মৃত্যু ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর অধিক ফল হয়।

নবম রচনা

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
অখিলের বিপদভঞ্জন।
ডাকিতেছি প্রাণপণে, শুনে কি শুন না কানে,
বধির হয়েছে কি কারণ॥
তোমার পালিত সৃষ্টি, একবার কর দৃষ্টি,
আছি নাথ চাতকিনী প্রায়।
জানিয়া মনের কথা, কেন কর কপটতা,
আর কত জানাব তোমায়॥
নির্দ্দয় দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
তুমি নাথ দয়ার সাগর।
আমি নারী পরাধীনা, তাতে পুনঃ শক্তিহীনা,
কৃপণতা আমারি উপর॥
এই চরাচরে কত, আছে পাপী শত শত,
মুক্তিপদ পাইবে সকলি।
ছাড়ি এ অবলা জনে, উদ্ধারিবে জগজনে,
দেখিব কেমন ঠাকুরালী॥
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, পতিত জনের গতি,
নাম ধর পতিতপাবন।
রাসসুন্দরীর হাতে, পারিবে না ছাড়াইতে,
দিতে হবে অভয়চরণ॥

পরমেশ্বরের কাণ্ড বুঝা ভার। তিনি যে কখন কি করিবেন তাহা তিনিই জানেন। আমি যে পর্য্যন্ত আপনার হাতে খাইতে শিখিয়াছি (এ কথাটি আমার বেশ স্মরণ আছে), সে পর্য্যন্ত আমি কখন আপনার হাতে ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে খাই নাই। অদ্য ১২৮০ সালের ২৭শে ভাদ্র অবধি এত কাল পরে সেই বাল্য অবস্থাটি ঘটিয়াছে। আমার পাক প্রস্তুত, খাইতে বসিব, এমত সময়ে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলীটিতে দৈবাৎ আঘাত লাগিয়া রক্ত প্রবাহিত হইল। তখন কাজে কাজেই আপনার হাতে খাওয়া হইল না, অন্য এক জনের সাহায্যে খাইতে হইল। বস্তুতঃ যখন আমাদের নিজের ইচ্ছা মতে আমরা আহারও করিতে পারি না, তখন পরমেশ্বর ভিন্ন আমাদের কোন কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে কেন আমাদের মনে এত গৌরব! অতএব পরমেশ্বর ভিন্ন আর সকলি মিথ্যা। তবে লোকে কেন বলে আমার শরীর, আর বাটি, আমার ঘর। ফলতঃ আমার আমার সকলই মিথ্যা ; মনুষ্যের মনের ভ্রম আর যায় না।

এ কথা ক্ষান্ত থাকুক, এখন যাহা বলিতেছি তাহাই বলি। পুত্র-শোক প্রবল যন্ত্রণা যদিও আমার অন্তরে দিবারাত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তথাপি এককালে পাতিত করিতে পারে নাই। আমার বুদ্ধির চালনাশক্তি না হইতেই আমার মা আমাকে মহামন্ত্র দয়াময় নামটি বলিয়া দিয়াছেন। সেই মহৌষধ আমার অস্থি ভেদী হইয়া রহিয়াছে। আমার শরীর মন যখন বিষয়ের হলাহলে এককালে আচ্ছন্ন ও অবশ হইয়া পড়ে, তখন আমার সেই অস্থিভেদী বিশল্যকরণী প্রবল হইয়া আমার শরীরের সমুদয় ব্যাধি শান্তি করিয়া, আনন্দ-রসে মনকে পরিতোষ করে। তখন এ সকল বিষ-জ্বালা আমার মনে আর প্রবেশ করিতে পারে না! ঐ সমুদয় রিপু এককালে পরাস্ত হইয়া আমার মন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পলায়ন করে। বিশল্যকরণীর এত গুণ যে হৃদয়ে প্রবেশ মাত্রই বিপক্ষ পরাস্ত হইয়া যায়। আহা! এমন যে মহারত্ন বিশল্যকরণী, যাহার ঘ্রাণে শরীর ও মনের কুপ্রবৃত্তিরূপ বিসজ্বালা সমুদয় জীর্ণ হইয়া অমৃত স্রোতে শরীর মন এককালে পরিপূর্ণ হয়। হায় হায়! এই মহৌষধি না চিনিয়া লোকে নানাপ্রকার

যন্ত্রণানলে দগ্ধ হয়। আহা একি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! আমরা যে চক্ষু থাকিতেই অন্ধ হইয়াছি. তাহার আর সন্দেহ নাই। লোঁকে বিবেচনা করে যে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী আছে, সে স্থানে যাওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম, আমাদের সাধ্য নাই, আমরা সে বিশল্যকরণী কোথায় পাইব। আহা! কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের মনের কি এত ভ্রম। সেই ঔষধের বীজ যে আমাদিগের চিত্তক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছে আমরা তাহার কিছুই জানি না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। আমরা তদ্বিষয়ে যত্নবান না হইয়া নানা প্রকার দুঃখার্ণবে মগ্ন হই। একি আমাদের সাধারণ দুরদৃষ্টের কর্ম্ম! আমাদের হৃদয়-প্রকোষ্ঠ এমন রত্নপূর্ণ রহিয়াছে যে (আমরা এমন হতভাগ্য) তাহা আমরা খুলিয়া না দেখিয়া দীনদরিদ্রের মত হাহাকার করিয়া দিবারাত্র কাঁদিয়া বেড়াই, একি সামান্য দুঃখের বিষয়! ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমার যদি মাতৃদত্ত এই মহামন্ত্র ধন না থাকিত, তাহা হইলে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, কৃপাময়ের কৃপাতে আমার মন সতত প্রেমানন্দেই পরিপূর্ণ আছে। ইহাতেই আমি কৃতার্থ হই। হে দয়াময় দীনবন্ধু পরম পিতা! তোমার যে কত দয়া আমাদিগের উপর স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না এবং জানিয়াও জানি না। পিতঃ! তুমি আমাদের এই শরীরের মধ্যে কত অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া রাখিয়াছ। আমরা এই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি এবং সর্ব্বদা এই শরীর নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে কখন কি প্রকার ঘটনা হইতেছে, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিতেছি না। হে নাথ দয়াময়! তোমার কৌশলের কণিকা মাত্রও আমরা জানিতে পারি না, তাহাতে আবার তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। হে নাথ! যে তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহে, সে নিতান্ত অজ্ঞান, তাহার তুল্য নির্ব্বোধ আর নাই। কিন্তু আমাদের মনে এই কথাটি বড় বিশ্বাস আছে যে, তুমি ভক্তবৎসল। বিশেষ তুমি আপনি বলিয়াছ যে, ভক্ত আমার মাতাপিতা, ভক্ত আমার প্রাণ; ভক্তের হৃদয় আমার বিশ্রামের স্থান। তোমাকে যে একান্ত মনে ডাকে, তাহার নিকটে তুমি বিনা বন্ধনেই বন্দী হইয়া থাক।

যাহা হউক, আমার সকল কর্ম্মের মূল কারণ তুমি। আমার মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহা সমুদয় তুমি জান, তোমার অগোচর কিছুই নাই! যখন আমার মন পুস্তক পড়িবার জন্য ব্যাকুল থাকিত, তখন তুমি এমনি কৌশল করিলে যে, ঐ বাটীতে যে সকল পুস্তক ছিল, আমি সে সমুদয় ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে সমর্থ হইলাম। আমি মনের মধ্যে এই কথাটি ভাবিলে আমার মনে ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়। যখন আমি লেখাপড়া কিছু জানি না, তখন আমি যে আবার পুস্তক পড়িতে পারিব ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাস্তবিক এমন অবস্থায় লেখাপড়া শিক্ষা করা—কেবল সেই জগৎপিতার বাঞ্ছাকল্পতরু নামের মহিমা মাত্র; তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, পরমেশ্বর আমারতো বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন! আমার মন যেমন পুস্তক পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তেমনি পুস্তক পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে! ঐ বাটীতে যে কিছু পুস্তক ছিল, ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত আঠারপর্ব্ব, জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি-পুরাণ—এই সকল পুস্তক ঐ বাটীতে ছিল। কিন্তু বাল্মীকি-পুরাণের আদিকাণ্ড মাত্র ছিল, সপ্তকাণ্ড ছিল না।

পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির মনের ভাব এই প্রকার করিয়াছেন যে, যে কোন বিষয় হউক না কেন, যদি তাহার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র পায়, তাহা হইলে সেটি সম্পূর্ণ পাইতে ইচ্ছা করে; সেটি মনের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। ঐ বাল্মীকি-পুরাণের আদিকাণ্ড পড়িয়া সপ্তকাণ্ড পড়িবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু ঘরে ছিল না। সেত পল্লীগ্রাম, অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, গ্রামের মধ্যে পাওয়া গেল না। আমার মনও কোনমতে মানে না, কি করিব, ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার দ্বারকানাথ নামে পঞ্চম পুত্র কলিকাতার কলেজে পড়িত। আমিতো লিখিতে জানি না, যদি আমি তাহাকে পত্র লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত চিন্তার কারণ ছিল না। আমি যে পুস্তক পড়িতে পারি, এ কথাটি তখন প্রায় সকল লোকেই জানিতে পারিয়াছিল। আমি পুস্তক পড়িবার জন্য যে প্রকার কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা সকলে

জানিতেন না। পরে সকলে শুনিয়া আমার প্রতি ভারি সন্তুষ্ট হইলেন, আমি ইহা বড় ভাগ্যের কথা বলিয়া মানিয়াছি। আমি পূর্ব্বে অতিশয় ভয় করিতাম, কিন্তু পরে দেখিলাম যে এ বিষয়ে আমার প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট হন নাই, বরং আরও ভালই বলিতেন! সে যাহা হউক, আমি যদি তখন ঐ পুস্তক একখানি চাহিতাম, তাহা অনায়াসে পাওয়া যাইত। কিন্তু আমি প্রাণান্তেও কাহার নিকট আমাকে 'দাও' বলিতে পারি নাই। 'দাও' এই কথাটি আমার নিকটে ভারি কঠিন কর্ম্ম বোধ হইত; এখন বরং ছেলেদিগকে দুই একটা কথা বলিতে পারি।

যাহা হউক আমার মন সেই সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি-পুরাণের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সেই ছেলেটি কলিকাতা হইতে বাটীতে আসিল। আমি তাহার নিকট বলিলাম, দ্বারি! তোমাদের ঘরে অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু সপ্তকাণ্ড নাই। তাহার একখানা পাইলে বড় ভাল হয়। দ্বারি বলিল, মা! আমি কলিকাতা যাইবামাত্রই আগে আপনাকে সেই পুস্তক পাঠাইয়া দিব। অনন্তর সে কলিকাতা গেল। আমার মন ঐ পুস্তক পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিল যেন আমার শরীরে কত রোগ উপস্থিত হইয়াছে। মনের এই প্রকার যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

কতক দিবস পরে ঐ পুস্তক আসিয়া বাটীতে পৌঁছিল। আমি প্রাপ্তিমাত্রেই মহা আহ্লাদিত হইয়া হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার ছাপার অক্ষর অতি ক্ষুদ্র। এজন্য ও পুস্তক আমার পড়া হইল না। তখন আমার মনে যে কত কষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না। আমি ঐ পুস্তক হাতে লইয়া পরমেশ্বরের প্রতি অনুযোগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আর মনের মধ্যে বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ! এ পুস্তকখানি যদিও এত দিবস পরে তুমি আমাকে দিলে, তাহাও আমার পক্ষে নিষ্ফল হইল। আমি এত যত্নে এ পুস্তক আনিলাম, কিন্তু পড়িতে পারিলাম না। এই কথা বলিয়া চক্ষের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার আমার ভারি লজ্জা হইতে লাগিল, ছি ছি! আমি কাঁদি কেন? আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কাঁদ কেন?

—তাহা হইলে আমি কি উত্তর করিব। এই ভাবিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিলাম, কেন, আমি কাঁদি বা কি জন্য? পূর্ব্বেতো আমি লেখাপড়া কিছুই জানিতাম না, তাহা আমাকে কে শিখাইয়াছে। যিনি সদয় হইয়া দয়া করিয়া আমাকে এত দিয়াছেন, তাঁহার যদি কৃপা থাকে, তবে ও পুস্তকও আমি অনায়াসে পড়িতে পারিব।

এই ভাবিয়া কান্না সম্বরণ করিয়া মনঃস্থির করিলাম, পরে ঐ পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ঐ ছাপার অক্ষর অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আমার বেশ পড়া চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম, এ ছাপার লেখা, এ লেখা বুঝি আমি পড়িতে পারিব না। পরে দেখিলাম, সে কালের হাতের লেখার অপেক্ষা ছাপার অক্ষরই উত্তম। আমি যেমন অল্প জানি, তাহাতে আমার পক্ষে ছাপার লেখাই ভাল। তদবধি আমি সকল প্রকারের অক্ষরই কিছু কিছু পড়িতে পারিতাম। কিন্তু লেখার বিষয়ে আমি কখনও মনোযোগ করি নাই, এজন্য লিখিতেও জানি না; মধ্যে মধ্যে এই কথাটি আমার মনে বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইত! আমি সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকটে এই বলিয়া রোদন করিতাম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে সকল বিষয়ে প্রায় এক মত ভালই রাখিয়াছ। সংসারের বিষয়ে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক, আমাকে তাহা তুমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সকলই দিয়াছ। কিন্তু এই কথাটি আমার মনে ভারি আক্ষেপের বিষয় যে, আমি লিখিতে জানি না। তুমি আমাকে লিখিতে শিখাও। পরমেশ্বরের নিকট দিবারাত্র এই বলিয়া কাঁদিতাম। এই অবস্থায় আমার অনেক দিবস গত হইয়াছে। আমি যে আর লিখিতে শিখিব, আমার মনে এমন ভরসাও ছিল না।

পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দৈবাৎ এক দিবস আমার সপ্তম পুত্র কিশোরী-লাল বলিল, মা! আমরা যে পত্র লিখিয়া থাকি, তাহার উত্তর পাই না কেন? আমি বলিলাম, আমি পড়িতে পারি, এজন্য তোমাদের পত্র পড়িয়া থাকি। আমিতো লিখিতে জানি না, সেজন্য উত্তর দেওয়া হয় না। তখন সে বলিল, মা! ও কথা আমি শুনি না, মায়ের পত্রের উত্তর না পাইলে কি বিদেশে থাকা যায়! পত্রের উত্তর দিতেই হইবে।

এই বলিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত, কালি সমুদয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়া সে কলিকাতায় পড়িতে চলিল। আমি বড় বিপদেই পড়িলাম; আমি মোটেই লিখিতে পারি না, কেমন করিয়াই বা লিখিব। আমি যে একটু একটু পড়িতে পারি, তাহা হাতে লিখিতে পারি না। তবে যদি অনেক চেষ্টায় দুই এক অক্ষর যেমন তেমন করিয়া লেখা যায়, সংসারের কাজের জন্য লিখিতে অবকাশ পাওয়া যায় না! ছেলেও বার বার মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছে, উত্তর না দিলেই চলিবে না। আমি ভাবিতে লাগিলাম কি করিব, একি দায় আমার যে বিষম সঙ্কট হইল।

এই প্রকার ভাবিতেছি; ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিবস কর্ত্তাটির সান্নিপাতিকের পীড়া হইয়া চক্ষের পীড়া দেখা দিল। তখন ঐ চক্ষের চিকিৎসা করিতে কর্ত্তাটি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলেন। সে সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইল। আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথের বিষয়-কর্ম্মের স্থান কাঁঠালপোতা, আমাদের সেই বাসাতে থাকা হইল। সেই স্থানে আমাদিগের ছয় মাস থাকিতেও হইল। তখন বাটীর অপেক্ষা আমার কাজের অনেক লাঘব হইল। সেই অবকাশে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আমার হস্তগত হইল।

আমার লেখাপড়া বড় সহজ কষ্টে হয় নাই, যাকে বলে কষ্ট। সে লেখাপড়ার কথা আমার মনে উদয় হইলে ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমাকে যেন পরমেশ্বর নিজে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন। নতুবা এমন অবস্থায় লেখাপড়া কোন মতে সম্ভবে না। যাহা হউক আমি যে এক-আধটি অক্ষর শিখিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার পরম সৌভাগ্য। বোধ হয়, এরূপ একটু না জানিলে, আমিতো সম্পূর্ণ পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহার সন্দেহ নাই। এ নিজস্ব পরমেশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি! তিনি আমার প্রতি এত দয়া করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। আর দিবারাত্র সম্পদে বিপদে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। আহা! যিনি এমন পরম বন্ধু, এমন প্রাণের সুহৃদ, আমি এমন অধমা যে একবারও তাঁহাকে স্মরণ করি না। আমার বাসনায় ধিক্, আমার মনুষ্য জন্মে ধিক্, আমার এ ছার জীবনেও ধিক্, আমি কেন এ পাপদেহ ধারণ করিয়াছি। আমার মানব-জন্ম মিথ্যা!

দশম রচনা

ওহে মন ভোলা, হইয়া বিভোলা,
ভুলিয়া রয়েছ কিসে।
বিভবেতে পশি, মধুর কলসী,
জারিছে দুষ্কৃতি বিষে॥
যদি পড়ে খসি, কেন রৈলে বসি,
তখন কি হবে বল।
ভাঙ্গিল এ মেলা, আর নাহি বেলা,
পসার তুলিয়া চল॥
ভবের বাজারে, বাণিজ্যের তরে,
এসেছিলে তুমি বটে।
ঘিরিয়া সঘনে, আছে দস্যুগণে,
কখন কি জানি ঘটে॥
মহাজনের মাল, রাখ এত কাল,
হিসাব করিতে হবে।
হুঁসিয়ারে থেকো, তিলে তিলে জেগ,
নিতে না পারে ঐ সবে॥
বাছিয়া কিনিতে, দর বুঝে নিতে,
দিবস হইল শেষ।
রাসসুন্দরী মত, যে আছে কিঞ্চিত,
লয়ে চল নিজ দেশ॥

আহা মরি মরি! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আপনার শরীর ও মনের বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলে মন এককালে অধৈর্য্য ও অবশ হইয়া পড়ে। আমার এই শরীর এই মন এই কাঠামেই কয়েক প্রকার হইল। আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব পূর্ব্বে কি প্রকার ছিল, এবং এখনি বা ক্রমে ক্রমে কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা বড় সহজ কর্ম্ম নহে; একটু কঠিন ব্যাপার বলিতে হইবে। বিশেষতঃ আমার শক্তিতে তাহার যে সম্পূর্ণ ঘটনা সমস্ত

ণীত হইয়া উঠিবে, এমন ভরসাও করি না। তবে কোনমতে ৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি—

আমার পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের অবস্থা, মনের ভাব কি প্রকার ছিল, তাহা আমি যদিও বলিতে পারি না, তথাপি বোধ হয় তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, আমার তাহার কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

পরে যখন সাত-আট বৎসরের ছিলাম, তখন আমার মনের জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। তখন আমার মনের বড় জড়তা ছিল এবং শরীর অতি সুকোমল বলহীন ছিল, এমন কি, আপনার শরীর পালনের ভারও অন্যের উপরে ছিল। নিজের শক্তিতে কোন কাজ হইত না। এই প্রকার অবস্থায় কতক দিবস গত হইয়াছে।

পরে বার বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই হইতে আমি আমার পিত্রালয়ের অতুল স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হইয়াছি। তখন আমার বাল্যভাব এককালে পরিবর্ত্তিত হইল, তখন আমি নূতন বৌ হইলাম। আমার অলঙ্কারাদি যে কিছু লাগে, তাহা সমুদয় নূতন হইল, আমিও নূতন বেশ ধারণ করিয়া, নূতন বৌ হইয়া, নূতন নূতন ব্যবহার সমুদয় শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ঐ বার বৎসর পরে এদিকে আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নূতন বৌই ছিলাম।

ইতিমধ্যে পরমেশ্বর আমার শরীরে যেখানে যে প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু লাগিবে, তাহার সমুদয় সরঞ্জাম দিয়া, আমার শরীরতরণী সাজাইয়া দিয়াছেন। আহা কি আশ্চর্য্য! কৌশলের বালাই লইয়া মরি! আমার শরীর হইতে এত গুলা ঘটনা হইতেছে, আমি তাহার কারণ কিছুই জানি না। হায়! একি ভেল্কীবাজী না কি, না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি; এইপ্রকার আমার মনের ভাব হইল, বাস্তবিক আপনার শরীর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে পরমেশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে, তাঁহাকে আর দূরে অন্বেষণের আবশ্যক হয় না। সহজ চক্ষে স্পষ্টরূপে বেশ দেখা যাইতেছে। আমাদের সেই দয়াময়, দয়ার সাগর পরম পিতা

আমাদিগকে সকল দিয়াছেন বলিয়া তিনি কি দূরে রহিয়াছেন, নহে, সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যখন ঐ সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে আমার শরীরতরণীর বাইচ হইয়াছিল, তখন সেই বিপদভঞ্জন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, ভয় নাই, ভয় নাই, বলিয়া সাহস প্রদান করিতেন। এমন কি, আমি যখন যে কাজ করিতাম, আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইত, যেন পরমেশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। যখন আমি ১৮ বৎসর হইলাম, তখন আমার প্রথম সন্তানটি হয়, ক্রমে ক্রমে আমার বারটি সন্তান হয়।

এই ১৮ বৎসর বয়স হইতে আর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব প্রায় এক মতই ছিল। সংসারের কাজকর্ম্মে ও ছেলেদের লালন-পালনে মনে ভারি মত্ততা থাকিত।

অনন্তর আমি ক্রমে প্রাচীন দলে পড়িলাম বটে, কিন্তু তখন পর্যান্ত সংসারের প্রতি মনের ভাবের কোন বৈলক্ষণ হয় নাই। পরে এ দিকে আর কয়েক বৎসর আমি যদিও সম্পূর্ণ সংসারী ছিলাম, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে বিলক্ষণ ঔদাস্য ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তখন শরীরের অবস্থাও ক্রমে লম্বমান হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সাতান্ন আটান্ন বৎসর প্রায় গত হইয়া গিয়াছে। তখন আমার তিনটি পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, তিনটি পুত্রবধূও হইয়াছে। ছোট কন্যাটির একটি পুত্র হইয়াছে, তখন আমি পতি, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা এবং বাটীর লোকজন ও প্রতিবাসিনীগণ এই সকলকে লইয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিয়াছি। কিন্তু পরমেশ্বর! তোমার ভঙ্গী বুঝা যায় না, তুমি সকলি করিতে পার।

সাপ হয়ে কামড়াও, ওঝা হয়ে ঝাড়।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার॥

১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বহি ১২৭৫ সালে যখন প্রথম ছাপা হয় তখন আমার বয়ঃক্রম উনষাইট বৎসর ছিল। এই ১৩০৪ সালে আমার বয়স অষ্টাশী বৎসর। এতকাল পর্যান্ত আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, এবং পরণ-পরিচ্ছদ ইত্যাদি যে কিছু ছিল, তাহা সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন তাহার বিপরীত অবস্থা হইল। লোকে বলে, মনুষ্যের অবস্থা সকল

কাল সমান ভাবে যায় না। কিন্তু দেখিলাম, সে কথাটি বড় মিথ্যা নহে, যথার্থই বটে।

খণ্ডিতে না পারে কেহ ললাটের অক্ষর।
কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা মহেশ্বর॥

পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ যেটি সেটি হবেই হবে। যাহা হউক, আমার এত কাল পরে সকল পথ অতিক্রম করিয়াও কূলের অতি নিকটে আসিয়াও পারি জমিল না।

"মৃত্যুর অধিক ফল মস্তক মুণ্ডন।"

পরমেশ্বর আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। ঐ ১২৭৫ সালে ২৯ মাঘী শিবচতুর্দ্দশীর দিবসে, আড়াই প্রহর বেলার সময় কর্ত্তাটির মৃত্যু হয়। আমার শিরে স্বর্ণমুকুট ছিল; কিন্তু এতকাল পরে সেই মুকুটটি খসিয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই উত্তম। ঐ ১২৭৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসে পুরোহিত গুণনিধি চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়।

সে যাহা হউক, আমার এতকাল প্রায় একপ্রকার অবস্থাতেই দিবস গত হইয়াছিল। এক্ষণে শেষ দশাতে বৈধব্য দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু একটি কথা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়, শুনিতেও দুঃখের বিষয় বটে।

শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়।
তথাপি তাহাকে লোকে অভাগিনী কয়॥

বাস্তবিক যদি আর কিছু না বলে, তুমি বিধবা হইয়াছ, এটি বলিতেই চাহে। সে যাহা হউক, আমার এই শরীর, এই মন, এই কাঠামই দেখিতে দেখিতে কয়েক প্রকার হইল, অনবরত আমার শরীরের মধ্যে খোদকারী হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি না। সেই কারিকরকে শত শত ধন্যবাদ দিই।

একাদশ রচনা

ধন্য ধন্য তুমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
ও চরণে অধিনীর এই নিবেদন॥
এসেছি ভারতবর্ষে অতি হর্ষ মনে।
হরিষে বিষাদ নাথ হয় কি কারণে॥
মণিহারা ফণী প্রায় বিষাদিত হিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে প্রাণ চমকিয়া চমকিয়া॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি॥
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী।
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়ানিধি॥
কি আর বলিব নাথ সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাহি ধন।
বাসনা আমার তব পদে থাকে মন॥
অসার সংসার মাত্র সার ধর্ম্মপথ।
তাহাতে রাসের যেন পূরে মনোরথ॥

হে পিতঃ করুণাময়! হে বিশ্বব্যাপী জগৎপালক! হে পরমেশ্বর! হে অনাথ নাথ! তোমার এ অনাথা তনয়াকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ কর, হে দয়ার সাগর! হে পতিতপাবন দীনবন্ধু! এ অধিনী কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর। হে দুর্ব্বলের বল! হে সর্ব্বশক্তিমান! হে নির্ধনের ধন! হে বিপত্তরণি! তোমার এ দুর্ব্বল সন্তানকে ভবতরঙ্গ হইতে পার কর। তোমা ছাড়া থাকিতে পারি না। হে নয়নের নয়ন! হে নয়নরঞ্জন! তুমি আমার নয়নান্তর হইও না, আমার নয়ন যেন তোমার ঐ মোহন রূপে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকে। হে মনের মন মনোধিপতি! আমার মনের সঙ্গে সম্মিলিত হও। আমার মন যেন তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ না থাকে। হে জীবনের জীবন! হে জীবনকান্ত আমার, হৃদয়াসনে তুমি আসীন হও, আমার হৃদয় যেন

তোমার মধুময় আলিঙ্গনে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমস্রোতে ভাসিয়া থাকে। এখনও আমার সেই শরীর সেই কাঠাম আছে ; কিন্তু পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তেমন নাই। আমি যে কর্ম্ম ইচ্ছা করিতাম, সেই কর্ম্মেই লাগিত। এখন আর শরীর-তরণী তেমন চলে না। এক্ষণে আমার সেই শরীরের অবস্থা কি প্রকার হইয়াছে, তাহাও কিঞ্চিৎ বলি।

চলিতে শকতিহীন জীর্ণ কলেবর।
স্থানে স্থানে হচ্চে বাঁকা লম্বিত অধর॥
লোলচর্ম্ম ক্রমে হ'ল শিরে শুক্ল কেশ।
গলিত হয়েছে দন্ত ছাড়ি গণ্ড দেশ॥
সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গী কি বলিব আমি আর।
দিন দিনে হচ্চে মম বিকৃতি আকার॥

যা হউক এখন আমার সেই শরীর থাকা ভার। এক্ষণে শরীর ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পরমেশ্বর যে সকল জিনিষ-পত্র দিয়া আমার শরীর-তরণী সাজাইয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ক্রমে ক্রমে আমার শরীর হইতে খুলিয়া লইতেছেন। এক্ষণে দেখিতেছি, সেই জীবনের জীবন আমার হৃদয়-সিংহাসনে চরণ দোলাইয়া বসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে সকল বস্তু দিয়া তিনি আমার শরীর সাজাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সমুদয় জিনিষ-পত্র একেবারে খুলিয়া লইয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিবেন। সে যাহা হউক, আমি এই একটি আশ্চর্য্য কথা ভাবিতেছি। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এতকাল যাপন করিলাম এবং এখন পর্য্যন্তও আছি। ইহার মধ্যে আদ্য অন্ত সকল কথা আমি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে মনে করিয়া দেখিলাম যে, আমাকে কেহ কখন মধুর বাক্য বৈ কটুবাক্য বলে নাই। কি আমার অন্তরঙ্গ, কি বৈরঙ্গ, কিম্বা প্রতিবাসিনী, কি কোন দেশস্থ লোক, কেহ যে কখন কোন প্রকারে আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, এমন আমার স্মরণ হইল না। আমি এইজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। পরমেশ্বর আমার প্রতি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অকপটে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল লোকে যে আমাকে এত স্নেহ এবং এত যত্ন করে, ইহাতে আমার এই জ্ঞান হয় যেন পরমেশ্বর ইহাদিগকে বলিয়া

দিয়াছেন। এই কথাটি মনে ভাবিয়া আমার মন ভারি আহ্লাদিত হয়। এই আহ্লাদে প্রায় এত দিবস আমার গত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সংসারের পূর্ব্বের ব্যবহার সমুদয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে প্রবৃত্ত বলিলেও হয়। যাহা হউক জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আমার এই শরীর হইতে যে কত আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অপর আর কি হইবে, তাহা পরমেশ্বর জানেন।

এক্ষণে আমার পরিবারের মধ্যে সকলের উপরে কেবল আমি আছি। আমার উপরে আর কেহই নাই, সকলে পরলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে আমারও পরলোক যাওয়ার সময় হইয়াছে, কিন্তু কোন্ দিবস সেই পরলোকে যাইতে হইবে, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। মৃত্যুর দিবস নির্ণয় না জানাতেই লোকে অনেক বিষয়ে ঠকে যায়, যদি মনুষ্যেরা মৃত্যুর সময়-নির্ণয় জানিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, মনুষ্যের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না! এক প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা আশা বৃক্ষটি প্রবল করিয়া দিয়াছেন। সেই আশার আশাতেই মনুষ্যের দিবারাত্র গত হইতেছে। আমি সেই অক্ষয়ফলের আশাতে এতকাল পর্য্যন্ত এ জীবন যাপন করিতেছি। হে, ফলাধিপতি! তুমি আমার জন্য কি ফল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ? আমি শেষকাণ্ডে না জানি কি ফলই বা প্রাপ্ত হই। সেই কথাটি মনে ভাবিয়া আমার শরীর মন একেবারে আচ্ছন্ন ও অবশ হইয়া পড়ে। হে নাথ পতিতপাবন! তোমার ঐ পতিতপাবন নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তুমি এমন প্রবল আশা দিয়া নিরাশ করিতে কখনই পারিবে না। আমার এ আশা তোমার পূর্ণ করিতে হবেই হবে। বিশেষ আমার মনে এই প্রকার একটি দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তুমি আমাদিগের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে সমুদয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ, সেটি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক আমাদিগের সকল সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াও তুমি ক্ষান্ত থাকিতে পার নাই। আমাদিগের জীবনে মরণে, সম্পদে বিপদে সকল সময় অহরহঃ তুমি সঙ্গে সঙ্গেই আছ; এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। যখন তোমার এমন অতুল দয়া আমাদের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে, তখন কি আর অন্য কথা আছে! তুমি

এমন প্রবল আশা দিয়া আবার নিরাশ করিবে, এমন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ তুমি অনাথের নাথ নির্ধনের ধন এবং বিপদের তরণী, দুর্ব্বলের বল, এই সকল নামটি তোমার জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তাহা কি তুমি এই ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য অন্যথা করিতে পারিবে, কখনই নহে। হে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান পরম দেবতা! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। এই চরাচরে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদয় তোমারি সৃষ্টি। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি চলিতেছে। আবার ইচ্ছা হইলে এই সৃষ্টি কটাক্ষে তুমি বিনাশ করিতেও পার। কিন্তু তোমার পক্ষে এই কর্ম্ম নিতান্ত অসম্ভব। তুমি কোন মতে এ কর্ম্ম করিতে পারিবে না। বাস্তবিক আমরা যদি তোমার নিকট অতিশয় ঘৃণাস্পদ কর্ম্মও করি, কিম্বা শত শত অপরাধেও অপরাধী হই, তথাপি তুমি তোমার কোল হইতে আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। আমরা যেখানে থাকি, সেখানেই তুমি আছ।

দ্বাদশ রচনা

নাথ হে জানাব কত, দীনের দিনতো গত,
মনের আক্ষেপ রৈল মনে।
কত সাধনার কর্ম্ম, মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম,
গত হ'ল নিদ্রায় সঘনে॥
হায় রে দারুণ মোহ, কেন বা করিলি দ্রোহ
নিদ্রা হ'তে না দাও চেতন।
তোর সনে কিবা বাদ, কেন ঘটাও এ বিষাদ,
শত্রুতা করিলি কি কারণ।
এ শত্রুতা তোমা সনে, স্বপ্নেও না ভাবি মনে,
জানি তুমি পরম বান্ধব।
পাতিয়া মায়ার জাল, মুগ্ধ রাখ এত কাল,
এখন তা ব্যক্ত হ'ল সব॥
এসে পিতা দয়াময়, ডেকে ডেকে ফিরে যায়,
রেখেছিলি এ মোহ বন্ধনে।
এ দেহে পেলাম নারে, আর কি পাইব তাঁরে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ জীবনে॥

সদানন্দ মহানন্দ পেয়ে যার দল।
অবধান করিবে ছাড়িয়া তার ফল॥
ভদ্র কুলোদ্ভবা আমি বিশেষ অবলা।
বিষয় কর্ম্মেতে মগ্ন সদা মনভোলা॥
নাহি জানি ভাল মন্দ মতামত যত।
পিঞ্জরেতে বন্দী আছি বনপশু মত॥
মনের আক্ষেপ হেতু লিখি কোন মতে।
বলিব কি বর্ণজ্ঞান শূন্য এ জগতে॥
সাধু জন নিকটেতে করি পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে প্রচার॥

দেশে বিদেশে, জলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে যেখানেই থাকি না কেন, সেখানেই তোমারি রাজ্য, তোমার কোলেই আছি। কোন মতে তোমার কোল ছাড়া হব না। কিন্তু আমাদের যেমন কর্ম্ম, তুমি তাহার উপযুক্ত ফল বিধান করিতেছ। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত কাল গত করিয়াছি, কিন্তু তোমার অনুগ্রহে বড় মন্দ অবস্থায় দিবস গত হয় নাই, এক প্রকার ভালই রাখিয়াছিলে। এক্ষণে আমার শেষ কাণ্ডে না জানি কেমন দুর্দ্দশা বা করিয়া দাও, তাহা তুমি জান। যাহা হউক পিতা তুমি আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখিবে তাহাই উত্তম। আমি যেন তোমার নামানন্দেই পরিপূর্ণ থাকি, আমার এই প্রার্থনা।

মন তোরে বুঝাব কত, নিজে তুমি বলে হত,
সেনাপতি হ'য়ে এলে রণে।
হইলে হইত জয়, রিপু ছিল পরাজয়,
মুক্তহস্তে এসেছিলে কেনে॥
তব ব্যবহার দেখে, সহজে হাসিবে লোকে,
রণভয়ে পলাইছ দূরে।
হায় কি বিষম দায়, সমর না হতে জয়,
জয়পত্র বাঁধ কেন শিরে॥

ত্রয়োদশ রচনা

জগতের প্রাণধন, বিশ্বব্যাপী নিরঞ্জন,
বিশেষ প্রকাশ তুমি মানব-হৃদয় হে।
তব গুণ প্রকাশিত, নাহি স্থান অবিদিত,
তব দয়া ভুবন-ভূষিত দয়াময় হে॥
পাষাণ দুর্ম্মতি যারা, ফিরে শান্তি হয়ে হারা,
তবু তব প্রেমনীর করে বরষণ হে।
তুমি চৈতন্যের মূল, নাহি তব সমতুল,
অকূলে পড়েছি নাথ, আমি অচেতন হে॥
ভবের তরঙ্গ-রঙ্গ, হেরিয়ে কাঁপিছে অঙ্গ,
এ সময়ে কোথা প্রভু দয়ার সাগর হে।
ডাকিতেছি সকাতরে, প্রভু প্রেমরত্নাকরে,
দুখিনীরে দুখার্ণবে, পতিত না কর হে॥
দেবঋষি বেদে কয়, তুমি দীনদয়াময়,
দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না হয় হে।
নামের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিত অবলার
রক্ষা হেতু ওহে নাথ করহ উপায় হে॥

স্বপ্ন-বিবরণ

পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সমুদয় ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন সকলি স্বপ্ন। বাস্তবিক স্বপ্নে লোকে নানা প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া থাকে। যখন জাগিয়া দেখে, তখন কিছুই নাই। সেই প্রকার পৃথিবীতে যত কিছু দেখা যায়, দেখিতে দেখিতেই নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলি স্বপ্ন তুল্য বোধ হয়! তন্মধ্যে এই একটি কথা আছে, স্বপ্ন দুই প্রকার, জাগ্রত স্বপ্ন, আর নিদ্রিত স্বপ্ন। এক দিবস রাত্রিযোগে জগন্নাথ মিশ্র নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, তাঁহার পুত্র নিমাঞীচাঁদ যেন মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিদ্রাবেশেই 'নিমাঞী, নিমাঞী' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

রোদন করিয়া উঠিলেন। ঐ স্বপ্নে তিনি যে প্রকার দেখিয়াছিলেন, বাস্তবিক সেই সমুদয় ঘটনা সত্য হইল।

সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথসুত ভরত যখন তাঁহার মাতুলালয়ে ছিলেন, তখন রামচন্দ্র বনগমন করাতে রাজা দশরথ সেই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে জানকী ও লক্ষ্মণ যান। বস্তুতঃ রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে এবং রাম লক্ষণ সীতা তিনজনই বনবাসে গিয়াছেন। আর অযোধ্যায় সকল লোক হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে। ভরত মাতুলালয়ে থাকিয়া নিদ্রাবেশে এই সকল স্বপ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জাগিয়া উঠিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভরতের স্বপ্নে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রাতে উঠিয়া শুনিলেন, সেই প্রকার সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

একদা সেইরূপ আশ্চর্য্য একটি স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছিলাম। তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। আমার একুশ বর্ষ বয়স্ক তৃতীয় পুত্র প্যারীলাল বহরমপুর কলেজে পড়িত। আমি বাটী আছি। আমার সেই ছেলেটি বহরমপুরে পড়িতে গিয়াছে। সে সেই স্থানেই আছে। ইতিমধ্যে এক দিবস নিদ্রাবেশে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন আমার প্যারীলাল কাহিল হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, এককালে আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি স্বপ্ন দোখতেছি, যেন আমিও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে পরে দেখিলাম, তাহার যেন মৃত্যু হইল। তখন তাহাকে মাটিতে শোয়াইয়া একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। আমি যেন সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু আমার শরীর মন স্বপ্নাবেশেই ঐ সকল কাণ্ড দেখিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবশ হইয়া পড়িল। আমি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে আবার দেখিলাম, যেন আমার প্যারীলালকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দাহ করিতে লাগিল। আমি যেন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আছি। অগ্নির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কাঁদিয়া বেড়াইতেছি! তখন আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে যেন, আমি ঐ

চিতার অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, কিন্তু তাহা পারিতেছি না। দাহনের পরে দেখিলাম, সকলে যেন চিতার সংস্কার করিয়া বাটীতে চলিয়া গেল। আমি যেন সেইস্থানে গঙ্গার চরের উপরে পড়িয়া প্যারীলাল! প্যারীলাল! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আর কাঁদিতেছি।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, একখানা ছোট নৌকা যেন গঙ্গার মধ্যে দিয়া আসিতেছে। সে নৌকাখানার উপরে ছৈ-টৈ কিছুই নাই! একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর একজন লোক ঐ নৌকাখানা বাহিয়া আসিতেছে; আমি কাঁদিতে কাঁদিতে একবার তাকাইয়া দেখি, যেন আমারি প্যারীলাল নৌকার উপর দাঁড়াইয়া আছে! এতক্ষণ আমি এত কান্না কাঁদিয়াছি যে, আমার চক্ষের জলে সকল গা যেন কাদাময় হইয়া গিয়াছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি যে পারে এতক্ষণ ছিলাম, এক্ষণে যেন সে পারে নাই, আমি যেন গঙ্গার ওপারে গিয়াছি। ঐ নৌকাখানাও যেন গঙ্গা পার হইয়া আসিতেছে। আমি ঐ নৌকার উপরে আমার প্যারী-লালকে দেখিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা এক মুখে বলা দুষ্কর। আমার শরীরে যেন তখন কত বলা হইল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'প্যারীলাল' বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমি যেন পাগলিনীর প্রায় হইয়াছি। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ নৌকা আসিয়া কূলে লাগিল। তখন আমি আমার প্যারীলালকে দেখিয়া পূর্ব্বের ঐ সকল কথা স্মরণ করিয়া কত প্রকার খেদোক্তি করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার প্যারীলাল যেন আমাকে অত্যন্ত বিপদে পতিত দেখিয়া মহাদুঃখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি যেন সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে 'প্যারী আয় রে!' বলিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু প্যারীলাল তাহাতে কোন উত্তর দিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে গঙ্গার চরের উপরে আমার নিকটে আসিয়া অতি মলিনবদনে মৃদুস্বরে বলিল, মা পুঁথি শুনিবেন? আমি আমার প্যারীলালের মুখের কথা শুনিয়া এবং আমার প্যারী জীবিত আছে দেখিয়া যেন এককালে স্বর্গের চন্দ্র হাতে পাইলাম। ঐ

স্বপ্নাবেশেই আমি মহা পুলকিত মনে উঠিয়া প্যারীলালকে কোলে ঝাপটিয়া ধরিয়া বলিলাম, কোথা পুঁথি হইতেছে, চল, আমি শুনিব। প্যারীলাল বলিল, তবে আমার সঙ্গে চলুন, এই বলিয়া প্যারীলাল আমার আগে আগে যাইতে লাগিল। আমি তাহার পাছে পাছে চলিলাম। এই প্রকার যাইতে যাইতে দেখিলাম, সম্মুখে যেন একটা রাজার বাড়ী দেখা যাইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে যাইয়া সেই বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সে বাটীতে দেখিলাম, কত উত্তম উত্তম দালান ও কোঠা রহিয়াছে। তাহাতে নানা প্রকার চিত্রবিচিত্র দ্রব্য সকল ঝলমল করিতেছে। আর একটি সুদৃশ্য দালান দেখিলাম। সেই দালানটির মধ্যে উত্তম একখানি সিংহাসন প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে কত লোক যে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। বাস্তবিক সেটা যেন বিচারালয়, এই প্রকার আমার বোধ হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, প্যারীলাল আমাকে একবার মাত্র বলিয়াছিল, মা পুঁথি শুনিবেন, আমার সঙ্গে চলুন! এই কথাটি ভিন্ন আমাকে আর কিছুই বলে নাই। আমি প্যারীলালকে পাইয়া যেন কত হারান ধন পাইলাম। এই প্রকারে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, প্যারীলালের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তখন প্যারীলাল আমাকে সেই আঙ্গিনাতে রাখিয়া, দালানের মধ্যে ঐ সিংহাসনের উপরে উঠিয়া বসিল। আমার পানে আর একবারও ফিরিয়া তাকাইল না। তখন আমি যেন সেই দালানের সম্মুখে আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছি, আর 'প্যারীলাল আইস' বলিয়া ডাকিতেছি। আমি যে স্থানে আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, সেই স্থান হইতে আমি প্যারীলালকে বেশ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি যে এত কাঁদিতেছি, আর এত প্রকার খেদ করিতেছি, প্যারীলাল তাহাতে কিছুই উত্তর দিতেছে না।

আমি এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিলাম। আমি জাগিয়াও যেন নিদ্রাবেশে স্বপ্নে কাঁদিতেছি। জাগিয়াও আমার শরীরে যেন সেই প্রকার ভাব রহিয়াছে। ঐ স্বপ্নে আমি এত কান্না কাঁদিয়াছি যে, জাগিয়া দেখি যে আমার চক্ষের জলে কাপড় এবং

বিছানা সকল ভিজিয়া গিয়াছে। আর আমি মুখে কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার মনঃপ্রাণ এমনি অস্থির এবং ব্যাকুল হইয়াছে, যেন আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছে। তখন আমি মনে মনে আমার মনকে কত প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, আমার মন কিছুতেই শান্ত হইল না। পরে আমি সেই তারিখটি লিখিয়া রাখিলাম।

তখন আমার ঐ প্রকার ব্যাকুলভাব দেখিয়া, বহরমপুরে লোক পাঠাইয়া সংবাদ আনীত হইল। আমি স্বপ্নে প্যারীলালের মৃত্যুর বিষয়টি যে প্রকার দেখিয়াছিলাম, অবিকল সেই প্রকার সমুদয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই দিবসে, সেই সময়ে, সেই প্রকার অবস্থায় আমার প্যারীলালের মৃত্যু হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখিয়া, কুস্বপ্ন বলিয়া যাহা মুখে বলিতে পারি নাই, বাস্তবিক তাহা প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া গিয়াছে।

মনের অলৌকিকতা

ওরে আমার মন! তুমি কি সত্যই আমার মন, আমার সর্ব্বস্ব তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া একবার আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হই, আবার বিষাদে অঙ্গ জর্জ্জর হইয়া যায়! তুমি কি আমার শত্রু কি মিত্র, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। মন! তুমি আমার মন মুখে বলি বটে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা দেখিতে পাই তোমার অসীম শক্তি; তুমি পলকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিয়া থাক, তোমার সঙ্গে অন্য কাহার তুলনা হয় না।

বাস্তবিক আমাদের মন কি আশ্চর্য্য বস্তু! এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই দেখা যায় না। এক দিবস মনের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য একটি ঘটনা হইয়াছিল, সেই ঘটনাটি বিশেষ করিয়া বলিতে হইল।

অন্তরে স্পষ্টদর্শন

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রামদিয়া গ্রামে আমাদের বাটী। আর ঐ জেলার মতালকে বেলগাছির থানা আছে। রামদিয়া হইতে

গিয়াছিল। সে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কিরে! ওরা কি আনিয়াছে? সে বলিল, মা ঠাকুরাণী! উহার কোলে বড় বাবু। আমি বলিলাম, বড় বাবু আবার কোলে উঠিয়াছে কেন? সে বলিল, আমাদের বড়বাবু ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া মাজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ঘোড়াতে উঠিতে পারিলেন না, এবং পাল্কীও পাওয়া গেল না, এজন্য তকি সরদার কোলে করিয়া আনিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি দেখিতে গেলাম। ঘরে বিছানা করিয়াছিল, বিপিন দ্বার হইতে ছেছ্ড়ি দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। তখন আমি গিয়া বিপিনের নিকটে বসিলাম। তখন অন্যান্য অনেক লোক আসিল এবং বাটীর সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিপিনের সঙ্গে যত লোক ছিল, তাহারা সকলে বলিতে লাগিল, এবং বিপিন নিজেই আদ্য অন্ত সকল কথা বলিল। সকলে শুনিয়া মহাদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কথা সত্যই সফল হইয়াছে, বিপিনের মুখে শুনিয়া এককালে অবাক্ হইলাম। কি আশ্চর্য্য! আমি সকল দিবস মনের মধ্যে যে যে ঘটনা দেখিয়াছি, বিপিন প্রত্যক্ষে সে সমুদয় কথা বলিতেছে।

বিপিন যে প্রকারে ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়াছিল, যে প্রকারে ঐ গ্রামের লোক বিপিনের বিপদ দেখিয়া হাহাকার শব্দে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সুস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, যে প্রকারে থানার ভিতরে লইয়া গিয়া একটি ছোট ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার আমি যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বিপিনও তাহাই বলিল। ফলতঃ আমি সমস্ত দিবস মনের মধ্যে যে সকল কাণ্ড দেখিয়াছিলাম, সেই প্রকার সমুদয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, প্রত্যক্ষে শুনিলাম। এই ব্যাপার আমি মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি, কি আশ্চর্য্য! এই কথাটি মনে ভাবিয়া আনন্দ রসে আমার চক্ষের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আমার চক্ষের জল দেখিয়া সকল লোক আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ঐ সকল লোক মনে করিল, আমি ছেলের জন্যই কাঁদিতেছি। বাস্তবিক সে কান্না আমার ছেলের জন্য নহে, পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কাঁদিতেছি। রাত্রি নহে দিবস, স্বপ্ন নয় আমি

জাগিয়া রহিয়াছি; তবে আমি কি প্রকারে বাটীতে থাকিয়া সকল ঘটনা জাজ্জল্যমান দেখিলাম; ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে, পরে ছেলের কষ্ট দেখিয়া বিষাদে অঙ্গ জর্জ্জর হইল। সে যাহা হউক, আমার মনের ভাব গতিক দেখিয়া আপনি বিস্ময় মানিলাম।

আমি আর একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি। সে কথাটিও তবে বলি।

মৃত্যু-কল্পনা

এই পৃথিবীতে যত লোক দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর নামে অতিশয় ভয় পাইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। লোকে না বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুর আশঙ্কায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে! মৃত্যুতে যে কিছুমাত্র ভয় নাই, আমি তাহা বিলক্ষণরূপে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। আমি তাহা এ জন্মে আর ভুলিব না।

এক দিবস আমার জ্বর হইয়া নিতান্তই কাহিল হইয়া পড়িয়াছি। এমন কাহিল হইয়াছি যে, এককালে আমার যেন আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি একখানা চৌকীর উপর শুইয়া রহিয়াছি। ইতিমধ্যে আমার এককালে শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। তখন আমি মনে মনে করিলাম, আমি খাটের উপর হইতে নীচে নামিয়া শুই। কিন্তু আমার হাত পা এমন অবশ হইয়াছে যে, আমি কত প্রকার চেষ্টা পাইলাম, কোন মতে নাড়িতে পারিলাম না। আমি কিছুমাত্র অজ্ঞান হই নাই। আমার মনের মধ্যে সকল কথা জুটিতেছে, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিতেছি না। আমার জিহ্বা এককালে অবশ। তখন আমার সকল ছেলেই প্রায় ছোট ছোট, কেবল দুইটি ছেলে একটু বড়। সেই দুটি ছেলে আমার দুই পাশে বসিয়া মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, আর কাঁদিতেছে। আমি অজ্ঞান হই নাই, একবার ভাবিতেছি, ছেলেরা কাঁদিতেছে, আমি উত্তর দিই না কেন? কিন্তু আমার জিহ্বা অবশ হইয়াছে, কথা কহিতে পারিলাম না। মনে মনে সকল কথাই বলিতেছি, কিন্তু কাজে কিছুই হইতেছে না। আমি দক্ষিণ-দ্বারী ঘরে

খাটের উপর শুইয়াছিলাম, চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, ঘরদ্বার সকল লালবর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার কিছুক্ষণ পরে, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সকলই একেবারে অন্ধকারময় হইল। তখন আমি চক্ষু বড় বড় করিয়া তাকাইলাম, সকলে 'গেল, গেল' বলিয়া আমাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। ঐ সময়ে আমার কি প্রকার হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি সকল লোককে বেশ দেখিতে লাগিলাম। আমাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতেছে, তাহাও আমি বেশ দেখিতেছি। আমার এই চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত আমি দেখিতেছি। আমাকে যখন ঘর হইতে বাহিরে আনিল, তখন আমার মাথাটা উহাদিগের হাত হইতে ঝুলিয়া পড়িল। তখন সেই স্থানে আর একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে লোকটি তাড়াতাড়ি গিয়া দুই হাত দিয়া আমার মাথাটা ধরিল, তাহাও আমি বেশ দেখিতেছি। পরে আমাকে লইয়া আঙ্গিনার মাটীতে শোয়াইল। কি আশ্চর্য্য! আমি আপনি মরিয়াছি, আবার আপনি কি প্রকারে সকল দেখিতেছি। তখন আমার চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া সকলে মহাশব্দ করিয়া কান্না আরম্ভ করিল। আমার বড় ছেলেটি আমার এক পাশে বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর তাহাকে ধরিয়া তাহার পিসী কাঁদিতে লাগিল। আমার মেজো ছেলেটি মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার আর আর ছেলেগুলি কাঁদিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা ছোট ছোট, তাহাদিগকে লোকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে। বাটীর কর্ত্তাটি ঘরের দ্বারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মোলো না কি, তবে যাক। আর ঐ আঙ্গিনাপোরা লোক তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে। আমাকে ঐ আঙ্গিনাতে মাটীতে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। ঐ বাটীর গোমস্তা ঠাকুর হরিমোহন শিকদার কখনও ঐ বাটীর মধ্যে আসিতেন না, এবং আমিও তাঁহাকে দেখি নাই। সেই ঠাকুরটি তখন আমার এক পাশে বসিয়া একবার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেছেন, একবার বুকে হাত, একবার মুখে হাত দিয়া নাড়িতেছেন, আর কাঁদিতেছেন। আর বলিতেছেন, হায় হায় কি হইল, মা আমাদের ছেড়ে গেলেন। ঐ প্রকারে তিনিও কাঁদিতেছেন। আর কর্ত্তাটি 'হরিমোহন' বলিয়া এক

একবার ডাকিতেছেন, আর তাঁহার চক্ষে দর দর করিয়া জল পড়িতেছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য! সকল ঘটনাই আমি দেখিতেছি, আর আমার নিজের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। আমার চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, তথাপি আমি এই সকল ব্যাপার স্পষ্ট দেখিতেছি। তখন জ্ঞান হইতেছে যে, আমি ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি, আমার জন্য সকলে এত কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু সেটি পারিতেছি না। কি জন্য যে পারিতেছি না, তাহাও বুঝিতে পারি না। এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ কাল গত হইল। বস্তুতঃ আমার যে কি হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

অনন্তর আমার চৈতন্য হইল। তখন বোধ হইল, যেন আমি নিদ্রা হইতে জাগিলাম, আমার শরীর বেশ সবল হইল, আমি মুখেও কথা কহিতে পারিলাম, হাত-পা গুলাও আমার বশ হইল। আমি দেখিলাম, মাটিতে শুইয়া আছি। তখন বলিলাম, আমাকে বাহিরে আনিয়াছ কেন? আমার মুখের কথা শুনিয়া এবং আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে ভারি গরম হইয়াছিল, এজন্য তোমাকে বাহিরে বাতাসে আনা হইয়াছে, এই বলিয়া সকলে আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পরে ঘরে লইয়া গেল। সে যাহা হউক, আমি আপনি মরিয়া আপনি এ প্রকার সমুদয় ঘটনাগুলা কেমন করিয়া দেখিলাম। কি আশ্চর্য্য! আমি আপনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি। বাস্তবিক আমার নিকটে এ বিষয়টি বড় আশ্চর্য্য-জনক। কিন্তু লোকের নিকট বলিতে আমার কিছু লজ্জা বোধ হয়—কেহ পাছে মনে করেন, এ কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, এ মিথ্যা কথা। বাস্তবিক আমি যথার্থ বলিতেছি, আমি যাহা সত্য দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

চতুর্দ্দশ রচনা

তুমি জগতের পিতা জগজ্জননী।
জগতে তোমারে সবে দিচ্চে জয়ধ্বনি ॥
পশু পক্ষী জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম ;
যথাশক্তি পালিতেছে তোমার নিয়ম ॥
তব কৃপাবলে জ্ঞান পেয়ে যত নরে।
কেন তব আজ্ঞা তারা শিরেতে না ধরে ॥
তাই বলি ধিক্ ধিক্ মানব সকল।
পশুর অধম হ'লে পেয়ে জ্ঞানবল ॥

প্রকাশ্য ভূত দৃষ্টি

লোকে বলে ভূত নাই, ভূত আবার কেমন! আমিও তাহাই ভাবিতাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যথার্থই ভূত আছে। এক দিবস আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, বোধ করি সেইটাই ভূত হইতে পারে।

এক দিবস আমি বেলা প্রহর খানেকের সময় স্নান করিতে যাইতেছি। আমাদের বাটীর দক্ষিণদিকে একটা বাগান আছে। সেই বাগানে প্রবীণ প্রবীণ তেঁতুল গাছ আছে। আমি স্নান করিতে যাইব, ইতিমধ্যে ঐ বাগানের মধ্যে গিয়া সেই তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছি। ঐ তেঁতুল গাছের সম্মুখে একটা বাবলা গাছ আছে; সেই গাছের একটা ডাল একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। সে স্থানে অধিক জঙ্গল নাই, দুই একটা ছোট ছোট গাছ আছে মাত্র। দিবাভাগে আমি যেমন ঐ গাছের দিকে তাকাইয়াছি, অমনি দেখিলাম, সেই গাছের হেলিয়া-পড়া ডালখানির উপরে একটা কুকুর শুইয়া রহিয়াছে। সে কুকুরটাকে যেন ঠিক মানুষের মত দেখাইতেছে। ঐ গাছের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া কুকুরটার পেট্টা রহিয়াছে। আর ঐ গাছের দুইদিকে কুকুরটার হাত-পাগুলা ঝুকিয়া পড়িয়াছে। ঐ হাত পায়ে বেশ রাঙ্গা শাঁখা ঝলমল করিতেছে। আমি দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টে ঐ কুকুরের পানে চাহিয়া রহিলাম, আর আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড

দেখিতেছি। গাছের উপরে কুকুর শুইয়া রহিয়াছে, ইহাই ত আশ্চর্য্য, আবার কুকুরের হাতে শাঁখা ঝলমল করিতেছে। কুকুরের হাতে শঙ্খ, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কাহার কখনও দেখা দূরে থাকুক, কেহ শুনেও নাই। আমি ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই কুকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। কুকুরটা এমনভাবে রহিয়াছে, আমি বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। আর আমি মনের মধ্যে ভাবিতে লাগিলাম যে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ডটা আমি একা দেখিলাম, অন্য কেহই দেখিল না। এই ভাবিয়া আমি একবার পিছের দিকে পলক খানেক ফিরিয়া চাহিয়াছি, অমনি ফিরিয়া দেখিলাম, আর কিছুই নাই। তখন আমি সেই গাছের নীচে যাইয়া পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, সে কুকুরটা ত নাই! সে সময়ে সে স্থানে সেটা ভিন্ন অন্য পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দিবাভাগে আমি বেশ স্পষ্টরূপে দেখিলাম, এত বড় কুকুরটা চক্ষের পলকে কোথায় মিশাইয়া গেল, গাছের পাতাটাও নড়িল না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুই না দেখিয়া আমি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম। সকলের নিকট ঐ কুকুরের বিবরণ সমুদয় বলিলাম। শুনিয়া কেহ বলিলেন, সেটা ভূত, কেহ বলিলেন, মিছা কথা, ধাঁধাঁ দেখিয়াছ, কেহ বলিলেন, এ কথা কখনও মিথ্যা হইবেক না, সেটা ভূতই যথার্থ। এই প্রকার সকলে বলিতে লাগিল। যাহা হউক, আমি যাহা দেখিয়াছি, বাস্তবিক সেটা ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দিবসে এ প্রকার ভূত দেখিলে লোকের নিকট অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়।

যাহা হউক, যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলা হইল। এই আমার ৬০ বৎসরের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত থাকিল।

আমার নাম মা, আমার পিত্রালয়ে যে নাম ছিল, তাহাতো অনেক কাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিনবিহারী সরকার, দ্বারকানাথ সরকার, কিশোরীলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র সরকার, এবং কন্যা শ্যামসুন্দরী আমি ইহাদিগেরি মা! এক্ষণে আমি সকলেরি মা।

আমার জীবন-বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্তই লিখিত হইল। অপর বৃত্তান্ত প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইলে লিখিত হইবেক।

পঞ্চদশ রচনা

শান্তিপুর নবদ্বীপ গঙ্গা পরিহরি।
বৃন্দাবন শুভযাত্রা বল হরি হরি॥
অনেক দিবস বাঞ্ছা করেছিল মন।
তীর্থ ছলে গিয়া কিছু করি পর্য্যটন॥
গয়া কাশী কিরূপ কিরূপ বৃন্দাবন।
তীর্থবাসী হয়ে লোক রয় কি কারণ॥
বেদে বলে বৃন্দাবন গোলোক সমান।
তাহা ছাড়ি কেন লোক রহে অন্য স্থান॥
বারাণসী পুরী বটে দ্বিতীয় কৈলাস।
সন্ন্যাসী রামাত দণ্ডী তথা করে বাস॥
অন্নপূর্ণা দরশনে বাঞ্ছা নিরন্তর।
নয়ন ভরিয়া হেরি প্রভু দিগম্বর॥
গয়াতে শ্রীপদ-চিহ্ন অতি নিরমল।
দরশন করি তনু হইবে সফল॥
বৃন্দাবন বলি মন কেঁদেছে আমার।
কি করিব কোথা যাব কিসে পাব পার॥
এমন সৌভাগ্য মম কত দিনে হবে।
আমার এ পাপ দেহ ব্রজভূমে যাবে॥
যোগিজন যে চরণ না পান ধেয়ানে।
সেই প্রভু দয়াময় দেখিব নয়নে॥
আশীর্ব্বাদ কর সবে কর দিয়া মাথে।
রাসসুন্দরী ব্রজে যেন পায় ব্রজনাথে॥

আমার জীবন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল, কি আমার জীবন চরিতের মধ্যে কর্ত্তার সম্বন্ধীয় কোন কথাই লিখিত হয় নাই! তাহাতে আমার বোধ হয়, এ পুস্তকখানি অঙ্গহীন হইয়াছে; যাহা হউক, আমি যে তাঁহার গুণবর্ণনে সমর্থ হইব, আমি এমন যোগ্য নহি। বাস্তবিক সে সমুদয় কথা বলা অতি বৃহদ্ব্যাপার! তাহা বিস্তারিত করিয়া

বলা আমার সাধ্য নহে, তবে কিঞ্চিৎ মাত্র বলিতে পারি যে, তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন। তেমন একটি লোক বড় দেখা যায় না। তাঁহার শরীরটি বেশ স্থূলাকার ছিল। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলে যেন কর্ত্রা কর্ত্তা বোধ হইত। অপরিচিত লোকও যদি হঠাৎ তাঁহাকে দেখিত, সেও চিনিতে পারিত যে ইনিই কর্ত্তা। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার কত দয়া ছিল, তাহার ত সংখ্যাই নাই। আর অপরাপর সকলের প্রতিও তাঁহার অতিশয় দয়া প্রকাশ পাইত। তিনি যেমন দয়ালু ছিলেন, তেমন দাতাও ছিলেন। এমন কি তিনি খাইতে বসিলে যদি কেহ আসিয়া বলিত আমি কিছু খাই নাই, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে খাইতে না দেওয়া যাইত, সে পর্য্যন্ত তিনি খাইতেন না, বসিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে খাইতে দিয়া পরে আপনি খাইতেন। তিনি রাজকার্যেও বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন, আর তিনি মামলা মোকদ্দমা বড় ভালবাসিতেন। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপ-বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন, তদুপযুক্ত তাঁহার বিশ পঁচিশটা মোকদ্দমা লাগাই থাকিত। কখন তিনি মোকদ্দমা ছাড়া থাকিতেন না। ভারী ভারী লোকের সঙ্গে তাঁহার কাজিয়া ছিল। কিন্তু কখনও কাহার নিকটে পরাজিত হইতেন না, মোকদ্দমা জয় করিয়াই আসিতেন। তাঁহার এমন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও এমন বিশাল কণ্ঠধ্বনি ছিল যে, যখন তিনি কোন ব্যক্তির উপরে বিক্রম প্রকাশ করিতেন, তখন গ্রামস্থ সকল লোক কম্পিত-কলেবর হইত। যত ভারী ভারী জমিদারের সঙ্গে তাঁহার মোকদ্দমা ছিল। দুই পরগণার জমিদার এক কুঠীয়াল সাহেবের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই ফৌজদারী মোকদ্দমা হইত। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসাদে ঐ সকল মোকদ্দমাই জয় হইত; একটি মোকদ্দমাতেও তিনি সাহেবের সহিত পরাজিত হইতেন না। আর দক্ষিণ বাড়ীর ভারী জমিদার মিরালি আমুদের সঙ্গেও তাঁহার অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমা ছিল। তালুক মুলুক লইয়া ঐ সকল কাজিয়া হইত। তেঁতুলিয়া নামে এক গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের বার আনা মিরালি আমুদের সম্পত্তি, অন্য চারি আনা হিস্যা ইঁহাদের আছে। ইহা ভিন্ন আর আর জমিজাতি লইয়াও অনেক গোলযোগ ছিল।

সেই মিরালি আমুদের সঙ্গে ক্রমাগত তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিয়াছিল। ঐ কর্ত্তাটির উত্তর দেশে কতকটা এলাকা আছে। একবার তিনি সেই উত্তর দেশে যান। তখন সকল ছেলে আমার জন্মে নাই, কেবল বড় ছেলে বিপিনবিহারী ৬ বৎসরের হইয়াছে। বাটীতে কেবল সেই ছেলেটি আছে। ইতিমধ্যে এক দিবস সেই মিরালি আমুদ হুকুম দিয়া ইহাদিগের অনেক প্রজাকে ধরিয়া মারপিট করিতে আরম্ভ করিল, এবং অনেক প্রকার যাতনা দিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে লাগিল। তখন বাটীতে যে গোমস্তা ছিল, সে পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য যে সকল লোক ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের কি সাধ্য আমরা কি করিতে পারি। বাটীতে কেবল আমি আছি, আমিও তত্তুল্য মামলা মোকদ্দমা কিছুই বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ এ সকল কর্ম্মের আমি কর্ত্তাও নহি। তখন ঐ প্রজাদিগের পরিবারগণ আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে যে প্রকার প্রহার এবং যাতনা দিয়া খাজানা আমায় করিয়া লইতেছে, তাহা সমুদয় বলিয়া বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। উহাদিগের কান্না দেখিয়া এবং ঐ সকল যাতনা মনে করিয়া আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমার যে ছেলেটি লইয়া বাটীতে আছি, সে ছেলেটিও পত্রলেখার উপযুক্ত হয় নাই। তখন আমি ঐ ছেলেটিকে উপলক্ষ করিয়া একখানি পত্র দিয়া একজন লোককে মিরালি আমুদের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। ঐ পত্র পাইয়া মিরালি আমুদ পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রজাগণকে খালাস দিলেন, এবং মিরালি আমুদ নিজে উদ্‌যোগী হইয়া তাঁহাদিগের প্রধান দুইজন মুরুব্বিকে আমাদিগের বাটীতে পাঠাইয়া সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। কর্ত্তাটি বাটীতে নাই, তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে এত বড় একটা কাজ করিয়া আমার মনে অতিশয় ভয় হইল। আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একেতো আমি মামলা মোকদ্দমার কিছুই জানি না, বিশেষ অনেক কাল ঐ মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে, কেহ নিষ্পত্তি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তার বিনা অভিপ্রায়ে আমার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। তিনি বাটীতে আসিয়া না জানি কত রাগ

করিবেন। ইহা ভাবিয়া আমার অতিশয় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। এমন কি ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কিছু দিবস পরে তিনি বাটীতে আসিলেন। এ বিষয়ে যে সকল মধ্যবর্ত্তী ছিল, তাহারা কিছু মাত্র চিন্তিত হয় নাই। কিন্তু কর্ত্তা শুনিয়া পাছে রাগ করেন, এই ভাবিয়া আমি মৃতপ্রায় হইলাম। পরে তিনি বাটীতে আসিয়া শুনিলেন, মির সাহেবের সঙ্গে যে মোকদ্দমা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আমার দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছে, এবং তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ কর্ত্তা বিশেষ বড় লোক ছিলেন, তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কর্ত্তার জীবনচরিত এই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত থাকিল।

ষোড়শ রচনা

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা

তুই শমন কি করিবি জারি, তুই শমন কি করিবি,
আমি কালের কাল কয়েদ করেছি।
মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি॥

শমন রে তুই যা রে ফিরি, হবে না তোর শমনজারী,
আমি সদর দেওয়ানী আদালতে ডিগরিজারী ক'রে নিছি॥
মিছা কেন করিস লেঠা, মানি না তোর তলপচিঠা,
আমি বাকীর কাগজ উসুল দিয়ে দাখিল ক'রে ব'সে আছি॥

আহা ধর্ম্ম কি অপূর্ব্ব পদার্থ! পৃথিবীতে ধর্ম্মের তুল্য দুর্ল্লভ বস্তু আর কিছুই দেখা যায় না। দেখ, রাজা যুধিষ্ঠির এই ধর্ম্মের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তথাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। এই ধর্ম্মের নিমিত্ত কত কত মহাত্মা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র কাতর হন নাই। ধর্ম্ম বিপদের সম্বল, ধর্ম্মের 'পরে আর ধন নাই, ধর্ম্মবলে সমুদ্রতরঙ্গে পতিত হইলেও গোষ্পদ তুল্য বোধ হয়। আহা জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার নির্ম্মিত কর্ম্মের কণিকা মাত্র মনের মধ্যে উদয় হইলে,

শরীর প্রাণ এককালে আচ্ছন্ন ও অবশ হইয়া পড়ে। এমন কি, স্বপ্ন দেখিলেও পরমেশ্বরের কর্ম্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণ দীপ্তিমান দেখা যায়।

১২৮০ সালে ২০এ আশ্বিনের প্রভাতের সময় আমি একটি স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি যেন, একটি নদীতীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, ঐ নদীর তীরে একখানি নৌকা রহিয়াছে, ঐ নৌকার উপরে একজন মাঝি বসিয়া আছে। আমার সঙ্গে একজন চাকরাণী আছে, সেও আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়া আছি, সেস্থান উত্তম বালুচর। ইতিমধ্যে উহারি কিঞ্চিৎ দূরে অল্প জায়গায় বৃষ্টি হইতেছে; সে বৃষ্টি সর্ব্বত্র হইতেছে না। ঐ বৃষ্টি অতি গভীর শব্দে নামিয়াছে।

আমি এক দৃষ্টে ঐ বৃষ্টির দিকে তাকাইয়া আছি। দেখি, সে বৃষ্টি যেন স্বর্ণবৃষ্টি হইতেছে! এই প্রকার দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি যেন আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তখন দেখিলাম, ঐ বৃষ্টিতে যেন স্বর্ণ চাঁপা সকল পড়িতেছে। তখন আমি এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া মহা পুলকিত হইয়া আমার ঐ চাকরাণীটিকে বলিলাম, দেখ, পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! স্বর্গ হইতে স্বর্ণ চাঁপা সকল পড়িতেছে, ঐ বুঝি পুষ্পবৃষ্টি। এই বলিয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া বলিতেছি, এস! আমরা এই স্বর্ণ চাঁপা কুড়াইয়া লই। তখন আমার ঐ স্বর্ণচাঁপা দেখিয়া মনে এত আহ্লাদ হইয়াছে যে সে আনন্দ আমার হৃদয়ে আর ধরিতেছে না। আমার মনের এই প্রকার ভাব বুঝিতে পারিয়া, ঐ নৌকার মাঝি আমাকে বলিতে লাগিল। আপনি ঐ স্বর্ণ চাঁপা দেখিয়া গ্রহণের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? ঐ স্বর্ণবৃষ্টি আপনার জন্যই হইতেছে। ও স্বর্ণ চাঁপা আপনি পাইবেন, আপনার নিকটেই আসিতেছে। তখন আমার মন কি পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইল, তাহা মুখে বলা যায় না।

এই প্রকার দেখিতে দেখিতে অমনি জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া দেখি, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তখন আমার নিকটে যাহারা ছিল, তাহাদিগের নিকটে ঐ স্বপ্নের কথা বলিতেছি। ইতিমধ্যে আমার সপ্তম পুত্রবধূর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া, স্বপ্নে যে এত

আহ্লাদ হইয়াছিল তাহার লেশমাত্রও থাকিল না, স্বপ্নের কথা সকল ভুলিয়া গিয়া, বিষয় বিষে শরীর মন এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন এই বিপদে পরমেশ্বর কি করিবেন, এই চিন্তাতেই মগ্ন হইলাম। ক্ষণকাল পরে, ঐ প্রসবিনীর গর্ভ হইতে একটি পুত্র সন্তান জন্মিল, ঐ পৌত্রটির মুখ দেখিয়া, তখন আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল এবং আহ্লাদসাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমার পৌত্র জন্মিয়াছে, এই ত পরমাহ্লাদের বিষয়। সংসারী লোকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা আহ্লাদ আর কি আছে! বিশেষ, স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া, সেই স্বর্ণ চাঁপা পরমেশ্বর আমাকে দিয়াছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসে আহ্লাদে আমি এককালে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ! হে পিতা পরমেশ্বর! নিদ্রিত জাগ্রত কর্ম্ম আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া, আমার জ্ঞান হইতেছে, যেন তোমাকেই দর্শন করিতেছি। হে পিতঃ! আমি তোমার অজ্ঞান সন্তান, তোমার গুণ-গরিমা আমি কি জানিতে পারি, তথাপি তোমাকে শত শত ধন্যবাদ দেই।

রামদিয়ার ১২৮০ সালের জ্বর বর্ণন

রাগিণী ধানশী—তাল খেম্‌টা

হায় হায় হ'চ্চে এই রামদিয়াতে জ্বরের মালখানা।
সন ১২৮০ সালে কার্ত্তিক মাসে যায় জানা॥
জ্বরের এম্নি যে রীতি, যার বাড়ীর যেটি,
ক্রমে ক্রমে শয্যাগত হচ্চে সকলটি;
আবার ভিন্ন দেশের লোক আইলে অম্নি পড়ে বিছানা॥
সে জ্বরের ভঙ্গী বুঝা ভার, হ'ল কি এবার,
রোগীদিগের ভাব দেখিয়া লাগ্‌চে চমৎকার;
ম'লাম গেলাম শব্দ মুখে মা বাবা বৈ বলে না॥
তাহে পোহায় না রাতি, একি দুর্গতি,
ঘরে ঘরে হাত ধরিয়া দেখ্‌ছে পার্ব্বতী;
যার ম'চ্চে সেই কাঁদ্‌চে ব'সে, ঔষধ-পথ্য মেলে না॥
আছে সরকারী বাড়ী, ঔষধের বড়ি,
বিনা মূল্যে দিচ্চে তারা লয় না তার কড়ি;
বাবুরা দয়া ক'রে দিচ্চে কত মিছরি আর সাগুদানা॥

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম রচনা

এস গো মা সরস্বতী পুরুক অভিলাষ।
নারায়ণ সঙ্গে আমার কণ্ঠে কর বাস।
পতি সঙ্গে এস আমার হৃদ্ সিংহাসনে।
পাদ স্পর্শে ধন্য হই জীবনে মরণে॥
প্রসন্ন বদনে বৈস হয়ে কুতূহলী।
মনের সাধে যুগল পদে দিই পুষ্পাঞ্জলি॥

চৈতন্য-চরিত-সিন্ধু, তরঙ্গের এক বিন্দু, তার কণা লিখে কৃষ্ণদাস।
রাসসুন্দরী মূঢ়মতি, তাহে শূন্য প্রেমভক্তি, যুগল-চরণ অভিলাষ॥

সন ১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, এইক্ষণে ১৩০৪ সাল হইতেছে। আমার বয়ঃক্রম মেটের কোলে ৮৮ বৎসর হইল। এই ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমি জীবন যাপন করিলাম, এবং এখনও আমি সেই কাঠামেতেই আছি। আমার বোধ হয় আমার সমান বয়সের লোক আমাদের বাসস্থানে অতি অল্প আছে। তাহাও আছে কি না সন্দেহ।

এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি ৮৮ বৎসর বাস করিলাম। জগদীশ্বর আমার এক জন্মেই বিলক্ষণ তিন জন্মের ভার বহন করিতে দিয়াছেন। এ কথাটি আমার বহু ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

সেই পরম পিতা বিশ্বব্যাপী বিশ্বপালক সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তার মনোহর সৃষ্টি দর্শন প্রতীক্ষাতে এই হতভাগ্য নরাধম রাসসুন্দরীর প্রতি সদয় হইয়া ৮৮ বৎসর কাল নিরাপদে জীবিত রাখিয়াছেন। হে নাথ দয়াময়! ধন্য, ধন্য, তোমার ঠাকুরালী ধন্য! তোমার নামামৃত আমার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মানব দেহ সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবন যাপন করিলাম। এখনও আমি আছি, এতকাল এখানে বসিয়া আমি কি কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি।

ওরে আমার মন! তুমি আমাকে একেবারে ভবকূপে ডুবাইয়া রেখেছ। ওরে আমার মন, তোমার কি এই কাজ? মন, আমার সর্ব্বস্বধন তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। মনরে, তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। মনরে, এই রত্নপূর্ণ ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষে কত অমূল্য রত্নের খনি রহিয়াছে। কত শত দরিদ্র আসিয়া এই ধন যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া মহাজন হইয়া বসিয়াছে। আমি নরাধম মায়ার দাস হইয়া বিষয় গর্ত্তে পড়িয়া আছি। হায়রে হায়, আমার মানব জন্ম বৃথা গেল। মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম, সে দুর্ল্লভ মানবদেহ পাইয়া রাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দ না ভজিয়া মন, তুমি এই মাকাল ফলে ভুলে রহিয়াছ। আমার জীবনের নিশি শেষ হইয়াছে, আর সময় নাই।

দ্বিতীয় রচনা

প্রভু জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন, বিপদভঞ্জন হরি।
করুণাসিন্ধু, অনাথ বন্ধু, এ ভব সাগরে তরি॥
মাতৃগর্ভ হইতে, তোর দয়ার স্রোতে, ভাসিতেছি নিরবধি।
আছ পদে পদে, স্থলাদি জলেতে, তুমি হে করুণা নিধি॥
ও রাঙ্গাচরণ, ভজনবিহীন, আমি অভাজন অতি।
মিছা প্রবঞ্চনে, তরঙ্গ তুফানে, সতত বিস্মৃত মতি॥
অন্তরের যত, আছ অবগত, অগোচর কিছু নাই।
এই রাসসুন্দরী, নিজগুণে হরি, রেখো পদে দিয়া ঠাঁই॥

ওরে মন পাষণ্ড! ওরে মন নরাধম! তুমি বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? সাবধান! সাবধান! সাবধান!! আমার পৈতৃক ধন, আমার মাতৃদত্ত ধন। আমি অতি বালিকাকালে আমার বুদ্ধির

অঙ্কুর হইতে না হইতে আমার মা আমাকে ঐ দয়াময় নামটী বলিয়া দিয়াছেন। সেই দয়াময় নামটি মহামন্ত্র ও মহা ঔষধি বিশল্যকরণী হইয়া আমার অন্তরে অস্থিভেদী হইয়া রহিয়াছে। মন রে খবর্দ্দার, খবর্দ্দার! প্রলয় দৈত্যগণ চতুর্দ্দিকে সব ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঐ দৈত্যগণ কোনক্রমে যেন আসার মন-ধনকে আক্রমণ করিতে না পারে। মন, তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি যেন বিস্মরণ হইও না।

গীত

দেখো যেন ডুবে না তরী, এই ভব-সাগরে তুফান ভারি।
মন হুঁসিয়ারে থেকো, তিলে তিলে জেগো,
গুরু বস্তু ধন যতনে রেখো, নিজে থেকো দ্বারে হইয়া দ্বারী।
এই ভব-সাগরে তুফান ভারি॥

এইক্ষণ আমার রয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছে। ভারতবর্ষে আমি এতকাল পর্য্যন্ত আছি। আর কতকাল থাকিব তাহার নির্ণয় নাই। যাহা হউক, আমার যখন ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম সেই সময় আমার জীবন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছিল। এক্ষণে জগদীশ্বর আমার শেষকাণ্ডে কি কাণ্ড করিবেন তাহা তিনিই জানে। এতদিন এখানে বসিয়া আমি কি কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, একবার মনে ভাবিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

আহা আমাদের সেই পরম পিতা কৃপাসিন্ধু কৃপা করে আমাদের ভবের স্কুলে শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন। আমরা সকলে মিলিয়া এই ভবের স্কুলে শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে উন্নত হইব বলিয়া আমাদের সেই দয়াময় পিতা কত প্রকার যত্ন করিতেছেন এবং কতই যে সাহায্য করিতেছেন তাহার কণিকামাত্রও জানিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা তাহার কিছুই জানি না, আমাদের মনের ভাব আমাদের পিতা যেন আমাদের খেলা করিতেই ভবের বাজারে পাঠাইয়াছেন। আমরা সকলে মিলিয়া মহাসুখে উদর পরিতোষ করিয়া মহানন্দে

নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছি। এই "ভবের খেলা, ধূলার খেলা" এই মিছা আমোদে ভুলিয়া আছি।

মন তুমি কি জানিয়াও জানিতেছ না? মনরে, তুমি নিশ্চিত জানিবে তুমি যাহার নিকট হইতে আসিয়াছ, যিনি তোমাকে এই ভবের বাজারে পাঠাইয়াছেন, পুনর্ব্বার তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সে কথা কি ভুলে গিয়াছ?

১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে। এইক্ষণ আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর, ভারতবর্ষে আমি অনেক দিবস আসিয়াছি। এত দিবস এখানে বসিয়া কি করিয়াছি? আমার জীবন-রত্ন নিরর্থক ক্ষয় করিয়াছি। আহা, কি আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে! এক্ষণে নিরর্থক বালকের ন্যায় রোদনে কি ফল আছে?

৯ রচনা

রাসের মন! বলি শোন্, পাগল হলি কি কারণ,
পাগলে কি জানে কোন ক্রম।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, চার যুগেতে এলি গেলি,
এখনও তোর ভাঙ্গল নারে ভ্রম॥

যিনি জগৎ কারণ, বিশ্বব্যাপী নিরঞ্জন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহাতে।
নাই তাঁর স্থানাস্থান, আছেন তিনি সর্ব্বস্থান, অবিদিত নাই ত্রিজগতে॥
শুন মন বলি তাই, তাঁর পরে আর নাই, সেই বস্তু গোলোকের ধন।
সেই হরি দয়াময়, বসাইয়া হৃদয়, জ্ঞান নেত্রে কর দরশন॥

হে প্রভু অধমতারণ, হে করুণাময় বিপদভঞ্জন হরি, তোমার দয়ার তুলনা নাই। তোমার লীলা গুণ বেদ বিধির অগোচর। হে নাথ, তোমার মাহাত্ম্য তোমার নামের গুণ আমি নরাধম কি বলিতে জানি? হে নাথ, তুমি যখন যাহা কর তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আজ আমি তোমার একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি। হে দয়াময়, আমার মন পাষাণ। তোমার আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া সেই পাষাণ মন আহ্লাদে

গলিয়া পড়িতেছে। হে প্রভু মদনগোপাল, তোমার আশ্চর্য্য দয়ার প্রভাব দেখিয়া আমার মন পুলকে পূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে। আজ আমার মনে আনন্দ আর ধরিতেছে না।

এই সকল কথা আমার মনের কথা, অন্য লোক কেহ জানে না। সেইজন্য এ কথাটি আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি। আমাদের সেকালে সেই একমত ব্যবহার ছিল। এখন সে সকল পরণ পরিচ্ছদ কিছুই নাই। সে যাহা হউক আমার নাকে একখানি বেশর ছিল, সে বেশরখানি অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। সেই বেশরের সঙ্গে ঐ রকম বেশর আর তিনখানি লাগান ছিল।

এই বাটীর নিকটে পুষ্করিণী আছে। এক দিবস আমি পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি। আমি আমার গলা জলে নামিয়া কাপড় কাচিতেছি, এমন সময় আমার কাপড়ের সঙ্গে বাধিয়া বেশরখানি গভীর জলে পড়িয়া গেল। যখন বেশর জলে পড়িয়া গেল সেই সময় ঐ বেশরখানি পাইবার জন্য কত লোক জলে নামাইয়া নানাপ্রকার করিয়া জলের মধ্যে তল্লাস করা হইয়াছিল। তখন কিছুতেই বেশরখানি পাওয়া গেল না। আর পাইবার কথাও নহে এবং ও বেশরখানি আর পাইবার আশাও মনে করি নাই।

যখন ঐ বেশর হারাইয়াছে তখন আমার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর। তখন আমার দুইটি পুত্র জন্মিয়াছে। তাহার পর আর আটটি পুত্র, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে জল শুকাইয়া পুষ্করিণীটি অকর্ম্মা হইয়া পড়িয়া থাকিল। সেই পুষ্করিণীর মধ্যে কত বৃক্ষাদি হইয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইল।

তাহার অনেকদিন পরে আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করে, সে ঐ পুষ্করিণীটি নূতন করিয়া কাটাইল। পুষ্করিণী কাটাইয়া মাটি পুষ্করিণীর ধারেই রাখা হইয়াছিল। কিছু দিবস পরে ঐ মাটি দিয়া পুষ্করিণীর ধারে প্রাচীর গাঁথান হইয়াছে।

পরে অনেক দিবস পরে সেই প্রাচীরের অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়; আর অর্দ্ধেক প্রাচীর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই ভাঙ্গা প্রাচীরটার উপরে আমার ঐ বেশরখানি যেন সমান হইয়া শুইয়া আছে।

ঐ বেশরখানির উপরে যে মাটি-চুটি পড়িয়া ঢাকা ছিল, বৃষ্টির জলে জলে সব ধুইয়া গিয়াছে। বেশরখানি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। সেটা আমাদের খিড়কীর ঘাট, আমি সেখানে দাঁড়াইয়া আছি। সেই স্থান হইতে ঐ বেশরখানি অল্প অল্প দেখিতে পাইতেছি। সেই বেশরখানি দেখিয়া আমি বলিলাম, "ওখানা কি দেখছি?" আমার নিকট একটি জেলেদের মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই মেয়েটি দৌড়িয়া ঐ বেশরখানি আনিয়া আমার হাতে দিল।

তখন ঐ বেশরখানি আমি হাতে করিয়া দেখিলাম, আমার সেই বেশরখানি বটে! ঐ বেশর হাতে লইয়া দেখিয়া আমার শরীর মন এককালে যেন অবশ হইয়া পড়িল। তখন আমার মনে কি ভাব হইল তাহা আমি কিছুই বলিতে পারি না। তখন আমার দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি আমার চক্ষের জল মুছিয়া ঐ বেশরখানি দেখিতে লাগিলাম।

জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। যখন আমার বয়স ২২ বৎসর তখন ঐ বেশরখানি আমার নাক হইতে খসিয়া গভীর জলের ভিতর পড়িয়াছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যখন আমার বয়স ৮২ বৎসর তখন আমার সেই বেশরখানি আমি পাইলাম। এই ৬০ বৎসর পরে আমার সেই বেশরখানি যেমন পূর্ব্বে আমার নাকে ছিল এখনও সেইমত আছে, স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!

জগদীশ্বর কি না করিতে পারেন? এই বেশরখানি ৬০ বৎসর হইল জলে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে, আর কখন যে বেশরখানি পাইব একথা কখনও মনেও উদয় হইত না। আর পাওয়ারও কথা নহে।

৬০ বৎসর এ বেশরখানি কোথায় ছিল? ৬০ বৎসর পরে আমার সেই বেশর কে আমার হাতে আনিয়া দিল? এই বেশরখানি ৬০ বৎসর জল, কাদা, মাটির মধ্যে ছিল, সেই মাটি নানা প্রকার তাড়ন করা হইয়াছে। পুকুর হইতে মাটি কাটিয়া নিয়াছে, সেই মাটি জল দিয়া পা দিয়া কাদা করিয়াছে, পরে সেই মাটি লইয়া পুষ্করিণীর ধারে প্রাচীর গাঁথা হইয়াছে। তখনও বেশর ঐ প্রাচীরের মধ্যেই আছে।

এত তাড়নেও বেশর পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল সেই মত আছে। ঐ বেশরখানি যদি আমার নিকট এতদিন থাকিত তাহা হইলে ভেঙ্গে-চুরে এতদিন কোথায় যাইত।

হে প্রভু দয়াময়, হে নাথ অধমতারণ, তুমি নির্ধনের ধন, দুর্ব্বলের বল, বিপদের তরণী। হে প্রভু কৃপাসিন্ধু, তুমি নিজগুণে সদয় হইয়া এই অধিনীর প্রতি দয়া করিয়া ঐ বেশরখানি আমাকে দিবে বলিয়া এই ৬০ বৎসর কত কষ্টে এবং যত্নে রাখিয়াছিলে, এবং আমার হাতেই দিলে। আজ আমার মনের আনন্দ মনে আর স্থান পাইতেছে না।

হে প্রভু, এই হতভাগ্য নরাধম রাসসুন্দরীর প্রতি তোমার এত দয়া প্রকাশ করিয়াছ। আমি ঐ বেশরখানি হাতে পাইয়া আমার জ্ঞান হইল, আমি যেন স্বর্গের চন্দ্র হাতে পাইলাম। আমি সোণা হারাইয়া ছিলাম, সেই সোণা আবার পাইলাম বলিয়া এত সন্তোষিত হইয়াছি একথাটি যেন কেহ মনেও না করেন, আমি সেই করুণাময়ের করুণা প্রভাব দেখিয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছি। সেই বেশর পাইয়া মনে করিলাম এ বেশর আমি কোথায় রাখি, কোথা রাখিলে মন সন্তোষ হয়। বেশরখানি ভাঙ্গিব না, যেমন আছে তেমনি থাকিবেক, কিন্তু মদনগোপালের অঙ্গে থাকিবেক, নাকে দিলে বড় হয় এই ভাবিয়া মদনগোপালের মাথার চূড়ার সঙ্গে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মদন-গোপালের মাথার চূড়ার সঙ্গে বেশর অতি উত্তম সাজিয়াছে।

প্রভু মদনগোপাল, তুমি তোমার অধিনী কন্যার বেশরখানি পুনর্ব্বার তাহার হাতে দিবার জন্য এত যত্নে রাখিয়াছিলে এবং ৬০ বৎসর পরে আমার হাতেই দিলে ঐ বেশরখানি হাতে করিয়া আমার জ্ঞান হইল যেন আমি তোমাকেই পাইলাম।

চতুর্থ রচনা

হে পদ্মপলাশ, ভক্ত হৃদে বাস, বিভু বিশ্ব নিকেতন।
বিকার বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন॥
তুমি সৃষ্টিধর, পূর্ণপরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর॥
অনন্ত, অব্যয়, অসুখ, অভয়, একমাত্র নিরাময়।
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধৃত, সত্য, সর্ব্বাশ্রয়॥
সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল, বিশ্বার্দ্ধ নিশ্চল, পরমব্রহ্ম সুপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অনন্ত অসীমা সর্ব্ব সাক্ষী অভিলাষ॥
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমে নিয়মে তোমার।
জলবিন্দু পর, শিল্প কার্য্যকর, রূপ দেও চমৎকার॥
পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, তোমারি নিয়মে হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই ভাবে সবে রয়॥
মাতার উদরে, দাও সবাকারে, জীবের জীবনদাতা।
রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দাও স্তনে, পানহেতু বিশ্বপিতা॥
জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, তোমারই নিয়মেতে।
তুমি পরাৎপর, পরম ঈশ্বর, কে পারে তোমায় জানিতে॥
তুমি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ পূর্ণ কর, এই কর দয়াময়।
রাসসুন্দরীর মন, হইয়া চন্দন, তব পদে লয় হয়॥

এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিলাম। হে প্রভু মদনগোপাল, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। আমি তোমাকে ডাকিতে জানি না। হে নাথ, আমি তোমাকে চিনি না, তোমার মহিমা আমি কি জানিব? আমার জীবনে আদি অন্ত যে পর্য্যন্ত আমার স্মরণ আছে, আমি মনে মনে ভাবিয়া বেশ করিয়া দেখিলাম, আমার মন, আমার শরীরের রোমে রোমে তোমার দয়া প্রজ্বলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। হে কৃপাসিন্ধু মদনগোপাল, তুমি নিজগুণে দয়া করে এই অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া আমার জীবনে মরণে সম্পদে বিপদে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, এবং

অহরহঃ আমার সঙ্গে আছ। ওহে নাথ দয়াময়, তোমার দয়ার তুলনা নাই, আমাদের এমন যে হৃদয়বন্ধু আছেন, আমি নরাধম চিনিলাম না। এমন বন্ধু থাকিতে তাঁকে একবার স্মরণও করি না, আমি এমনি হতভাগ্য নরাধম।

পঞ্চম রচনা

হে প্রভু মদনগোপাল কাঙালের ঠাকুর।
নির্ধনের ধন তুমি দয়ার সাগর॥
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি পতিত পাবন।
পতিতের গতি তুমি ব্রহ্ম-সনাতন॥
ও পদ ভজনহীন আমি দুরাচার।
অধমতারণ নাম জানা যাবে এইবার॥
কখন কোথায় নাথ কোন্ ভাবে রহ।
কে তোমায় জানিতে পারে যদি না জানাহ॥
প্রেম নাহি, ভক্তি নাহি, শক্তি নাহি আর।
তোমাকে জানিতে নাথ কি সাধ্য আমার॥
তুমি প্রভু কর্ণধার জগতের গুরু।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যাগ যজ্ঞ তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না জানি।
অন্যের অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥
যাহা কিছু মুখে বলি যা ভাবি অন্তরে।
সকলি জানিবে তোমায় পাইবার তরে॥
ভজন জানি না হে পদ্মপলাশ-লোচন।
নিজগুণে রাসসুন্দরীরে দেও হে দর্শন॥

১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে। এইক্ষণ ১৩০৪ সাল, আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল হইল আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। ভারতবর্ষে অনেকদিন বাস করা হইল, এখন কি যাইতে হইবে কি থাকিতে হইবে তাহার নির্ণয় নাই। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম,

জগদীশ্বর কর্ত্তা, তিনি যাহা করেন সেই উত্তম। কিন্তু নাথ অধিনীর এই প্রার্থনা, আমার সেই সময়, আমার প্রাণান্তের সময় দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিতে হবে, দেখ যেন তোমায় না ভুলি।

হে নাথ করুণাসিন্ধু, হে অনাথ বন্ধু, তোমার লীলার পারাপার নাই। তুমি সাপ হয়ে কামড়াও, ওঝা হয়ে ঝাড়; হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার। তোমার মন তুমি জান।

আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার মহিমা কি জানিতে পারি? হে নাথ, তোমার লীলা গুণ বেদবিধির অগোচর।

ষষ্ঠ রচনা

তুমি নারায়ণ, লক্ষ্মীকান্ত, মাধব মধুসূদন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি গোবিন্দ, গৌরচন্দ্র, গোপাল গোবৰ্দ্ধন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি রাধাবল্লভ, রাঘবকিশোর, রঘুবর রঘুনন্দন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি যদুকুল ধন, যশোদা নন্দন, কৃষ্ণ কংসনাশন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি শমন দমন, শ্রীশচী নন্দন, তুমি হে জগৎ জীবন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি পরম ঈশ্বর, পিতাম্বর, পদ্মপলাশ-লোচন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি বলিকে ছলিলে, তিন পদ দিয়া করিলে দান গ্রহণ।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
রাসসুন্দরী অতি অধম দুর্ম্মতি, জানে না সাধন ভজন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
আমায় করো না নিরাশ, ওহে শ্রীনিবাস, দিতে হবে রাঙ্গা চরণ

হে নাথ ভক্তবৎসল, তোমার নাম দয়াময়। এই দয়াময় নামটি ত্রিজগতে বিখ্যাত হইয়া আছে। এই রাসসুন্দরী হতভাগ্য নরাধমের জন্য হে নাথ, তোমার এ পরম পবিত্র দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তোমার চরণে আমি শত শত অপরাধে অপরাধী, হে দয়াময়, তুমি নিজগুণে সে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এ অধিনীর প্রতি সদয় হৃদয় দেখাইতেছ, পরে আমার কি করিবে তাহা তুমিই জান।

১২১৬ সালে আমার জন্ম হয়, এক্ষণে ১৩০৪ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর। এতকাল ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, কি কাজ করিয়া জীবনরত্ন ক্ষয় করিয়াছি? হায়রে হায়, মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার মানব জন্ম বৃথা গেল, পশু-পক্ষী জীব-জন্তু ইত্যাদি সকলেই উদর পূর্ণ করিয়া থাকে, অনাহারে কেহ থাকে না। ইতিমধ্যে কোন পাখীর যদি সাধুসঙ্গ মিলে, তবে সেই পাখীর মুখে রাধাকৃষ্ণ নামটি উচ্চারণ হয়। আমি হতভাগা, আমার ভাগ্যে সাধুদর্শন হইল না।

সপ্তম রচনা

দেখ্‌তে এসে ভবের মেলা, দেখি সব গেলা মেলা,
মনোহারী দোকান মেলা।
নানা রত্ন অলঙ্কারে, রাখিয়াছে থরে থরে,
সাজাইয়া রংমহলা।
আয়না চিরুণ মতির মালা, দোকান করেছে আলা,
তাই দেখে ভুললো নয়ন ভোলা।
সাধ ছিল বেঁধে ভেলা, পার হ'ব হেলে হেলা,
থাকিল তাহা মাথায় তোলা।
থাক্‌তে পিতা কৃপাসিন্ধু, কিন্‌তে এলাম রসসিন্ধু,
ঐ দোকানে তোলা তোলা।
রাসসুন্দরীর ভাগ্যগুণে, মন ভুলেছ ঐ দোকানে,
ধন খুঁজ্‌তে গেল বেলা।

গীত

মনরে বিপাকে পলি, সেই মাকাল ফলে ভুলে রলি।
দয়াময় পিতা কৃপাসিন্ধু, কৃপাসিন্ধু ছেড়ে রসসিন্ধু কিনতে এলি।
মনরে বিপাকে পলি ॥

এই ভবের বাজারে আসিয়া আমি চক্ষু উন্মিলিত করিয়াই ঐ মনোহারীর দোকান দেখ্‌তে পেলাম। তখন কি আর অন্য কথা মনে করিবার সময় থাকিল? তখন যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ঐ মনোহারীর দোকান, চতুর্দ্দিক সব ঝলমল করিতেছে। এই ভবের বাজারে যেদিকে তাকাইতে লাগিলাম সেই দিকেই মনোহারীর দোকান দেখ্‌তে পেলাম। ঐ মনোহারী দোকান দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। তখন মনে ভাবিলাম এই ভূমণ্ডলে মনোহারী দোকান ভিন্ন উত্তম পদার্থ বুঝি কিছু নাই।

ঐ সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া আমার মন এককালে মোহিত হইয়া পড়িল। আমিও ঐ মনোহারী দোকান একখানি পাতিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া ঘটা করিয়া বসিলাম।

এই রত্নপূর্ণ ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষে কত শত অমূল্য রত্নের খনি রহিয়াছে, কত দরিদ্র ঐ রত্ন কিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া মহাজন হইয়া বসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি ৮৮ বৎসর পর্য্যন্ত আছি, এত দিবস কি কাজ করিয়াছি? ঐ মনোহারী দোকানেই বসিয়া আছি।

ছি রে ছি! এই মায়া পিশাচীর দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বিষের গর্ত্তে পড়িয়া আমার জীবনরত্ন ক্ষয় করিয়াছি। হায়রে হায়, আমার মানব জন্ম বৃথা গেল! দুর্ল্লভ মানবজন্ম পাইয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ কেন ভজন করিলাম না? ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে ধিক্। "এ দেহে তায় পেলাম নারে আর কি পাব দেহ গেলে, ধিক্ ধিক্ জনম মানবকুলে। হরিপদ না ভজিয়ে দিন গিয়াছে হেলে হেলে, ধিক্ ধিক্ জনম মানবকুলে।" আমার বৃথা কাজে দিন গেল, আমার মানব জন্ম বৃথা হইল। ভারি আক্ষেপের বিষয়, মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

অষ্টম রচনা

ওহে নাথ, জগৎ তাত, সুদর্শনধারী,
দাও দরশন হৃদয়-রতন হৃদি বেদনা নিবারি।
সদয় হৃদয়ে এস হৃদি-সিংহাসনে,
মন-পুষ্প চন্দনেতে পূজিব চরণে।
তুমি হে মনের মন দেহের সারথী,
যেদিকে চালাও রথ তথা যায় রথী।
অনিত্য বাসনা দিয়া করো না বঞ্চন,
রাসসুন্দরীর যেন তব পদে রহে মন।

আমি ভারতবর্ষে অনেককাল বাস করিলাম। এখনও আমি আছি। আমার শরীরের অবস্থা ও মনের ভাব কোন্ সময় কি প্রকার ছিল এবং এখনি বা কিরূপ আছে তাহা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? যিনি আমার অন্তরে সততই বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আমার মনের অবস্থা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিতেছেন।

পূর্ব্বে আমার শরীর যেরূপ ছিল সে বহুকালের কথা। এক্ষণে তাহা বলাও বাহুল্য, এবং সে কথা শুনিলে এখনকার মেয়েছেলেরা বলিবে ইনি গৌরব করিয়া নিজের প্রশংসা জানাইতেছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। সে কথা যেন কেহ মনেও না করেন। আমাদের সেকালে যে প্রকার কাজের নিয়ম ছিল এবং আমি যে মতে কাজ করিতাম, বিশেষ আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহা কিঞ্চিৎ বলি।

আমাদের সেকালেতে মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা করা নিয়ম ছিল না। সেকালের লোকেরা বলিত "এ আবার কি? মেয়েছেলে লেখাপড়া করিতেছে? মেয়েছেলে লেখাপড়া করা বড় দোষ। মেয়েছেলে লেখা শিখিলে সর্ব্বনাশ হয়, মেয়েছেলের কাগজ কলম হাতে করিতে নাই।" এই প্রকার নিয়ম সর্ব্বত্রই চলিত ছিল।

এখন জগদীশ্বর সব বিষয়েই নূতন নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন, এখনকার নিয়ম দেখিয়া আমি বড় সন্তোষ হইয়াছি। এখনকার মেয়েদের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, এখনকার জন্য অতি উত্তম নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন।

এখন যাহার একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে, তাহার পিতামাতা সেই মেয়েটিকে পরম যত্নে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমি দেখিয়া বড় সন্তোষ হই, বেশ হইয়াছে। আমাদের সেকালে মেয়েছেলের লেখাপড়ার নিয়ম ছিল না, আমি লেখাপড়া কিছু জানি না। লেখাপড়ার কি মাহাত্ম্য তাহাও জানি না, আমাদের লেখাপড়ার কাজতো কিছু ছিল না, সংসারে কাজ যাহা তাহাই করিতাম।

আমি এতকাল যে সংসারে ছিলাম এখনও সেই সংসারে আছি। সে সংসারটি বড় মন্দ নহে, ঐ বাটীতে মদনগোপাল বিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছেন, তাঁহার অন্নব্যঞ্জন ভোগ হইয়া থাকে, অতিথি অভ্যাগতের গমনাগমনও এক প্রকার মন্দ নহে।

আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন, তাঁহার সান্নিকের পীড়া ছিল, তিনি চক্ষে দেখিতে পাইতেন না। এই দুই বিগ্রহ সেবা করা আমার সর্ব্বোপরি শিরোধার্য্য।

আমার দেবর ভাসুর কেহ ছিল না। আমি একমাত্র ছিলাম, আমার তিনটি ননদ ছিল। সে সময় তাঁহারা তাঁহাদের নিজ বাটীতে থাকিতেন। ঐ বাটীতে চাকর-চাকরাণী বিশ-পঁচিশ জন আছে, তাহা-দিগকে দুই বেলা ভাত পাক করিয়া দিতে হয়। আমাদের সেকালে ব্রাহ্মণে পাক করার প্রথা ছিল না। যত লোক খাইতে দিতে হইবে, সব পাক বাটীর মধ্যে করিতে হইবে। এই প্রকার সকল কাজের নিয়ম ছিল, আমি ঐ নিয়ম মতই সব কাজ করিতাম। এদিকে আমার দশটি পুত্র দুইটি কন্যা, এই বারটি সন্তান জন্মিয়াছে। এই বারটি সন্তান প্রতিপালনের ভার আমার প্রতিই সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

সেই বাটীর মধ্যে চাকরাণী আছে নয় জন। তাহারা সকল লোকই বাহিরের লোক। ঘরে কাজ-করা লোক নাই, কাজ-করা একমাত্র আমি আছি। ঐ বাটীর যে কর্ত্তাটি ছিলেন, তিনি স্নান পূজা সাঙ্গ হইলেই অন্য কিছু খাওয়া ভাল বাসিতেন না। ভাত পাইলেই সন্তোষ হইয়া খাইতেন। তজ্জন্য সকালে পাকের দরকার হয়।

ঐ সকলগুলা কাজ আমি একা করিয়াছি। প্রাতঃকালে পাক করিয়া ছেলেদের খাওয়ান, পরে স্নান করিয়া মদনগোপালের ভোগে

যাহা যাহা দরকার, সে সমুদায় সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর যাহা যাহা লাগিবে সে সমুদায় তাহার সম্মুখে রাখিয়া পরে পাকের ঘরে যাইতাম। আগে কর্ত্তার পাক রান্ধা হইত, পরে অন্যান্য পাক হইত। ঐ সংসারের যত কাজ ঐ সকলগুলা কাজ আমি একা করিতাম। আমার মনের ভাব যেন কেহ কোনমতে অসন্তোষ না হয়।

হে প্রভু দয়াময়, তুমি এই অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া এতই শক্তি দিয়াছিলে। আমি দশ জনার কাজ একাই করিতাম, ইহাতে আমার পরিশ্রম বোধ হইত না। হে প্রভু কৃপাসিন্ধু, হে দীনের বন্ধু হরি, তুমি যেন আমার শরীর পাষাণ দিয়া বেঁধে দিয়াছিলে। তোমায় দয়ায় আমার শরীরের রোগ বালাই কিছু ছিল না। এক্ষণে সেই শরীরের অবস্থা যে প্রকার হইয়াছে কিঞ্চিৎ বলি।

নবম রচনা

চলিতে শকতিহীন জীর্ণ কলেবর।
দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকে দেখি অন্ধকার॥
সেই শরীরে অকস্মাৎ বিধি বিড়ম্বনা।
হস্ত পদ পূর্ব্বের মত চলিতে চাহে না॥
ক্রমে ক্রমে সময় মতে ওই দশা ঘটিল।
দশেন্দ্রিয় সঙ্গে ছিল সব ছেড়ে চলিল॥
লোভ বেটা ছাড়ে না সঙ্গ ঘটিয়াছে দায়।
উদর ভায়া ব্যাকুল হয়ে সবার পানে চায়॥
কন্যারত্ন সযতনে নিযুক্ত সেবায়।
যখন যা প্রয়োজন সম্মুখে যোগায়॥

হে প্রভু মদনগোপাল, হে করুণাময় ভবসিন্ধুর তরি, তুমি অধম-তারণ, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল হরি। তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। আমি নরাধম, হে নাথ, তোমাকে চিনি না। তোমার চরণে কত শত অপরাধী। আমার অপরাধের সংখ্যা নাই, হে প্রভু দয়াময়,

তোমার নিজগুণে অধিনীর অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। যেন তোমার চরণ ছাড়া করোনা, আমার মন ছাড়া হয়োনা। এই নরাধম রাসসুন্দরীর এই প্রার্থনা, যেন তোমায় না ভুলি।

সংসারযাত্রা

হে প্রভু বিশ্বব্যাপী বিশ্বপালক, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা! তুমি এই সংসারযাত্রার অধিপতি অধিকারী মহাশয়! হে অধিকারী মহাশয়! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই হইয়া থাকে। তোমার সংসারযাত্রার দলে আনিয়া আমাকে যাত্রার আসরে এতদিন বসাইয়া রাখিয়াছ। আমি ৮৮ বৎসর যাত্রার আসরে একাসনে বসিয়া আছি।

অধিকারী মহাশয়! তোমার সংসারযাত্রা অতি আশ্চর্য্য যাত্রা। তুমি কত আশ্চর্য্য সাজ সাজিয়া যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছ। প্রথমে তুমি আমার মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন সমুদায় সাজিয়া সাজিয়া তোমার সংসারযাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে সে সমুদায় দেখাইয়া তুমি আমায় লইয়া গিয়াছ। তুমি যে কোন্ সময় কি করিবে তাহা তুমি আমায় লইয়া গিয়াছ। তুমি যে কোন্ সময় কি করিবে তাহা তুমি জান, কোন্ যাত্রার পালা কোন্ সময় সমাধা করিবে তাহা তোমার ঠিক আছে। তাহা অন্যের জানার শক্তি নাই। হে অধিকারী মহাশয়! তুমি যখন আমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী ও বন্ধুবান্ধব সাজাইয়া যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়া সমুদায় লইয়া গেলে, তখন আমার মনে অতিশয় আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু সে সময় তুমি ঐ সকল যাতনা নিবারণ করে রেখেছিলে।

তাহার কিছু দিবস পরে তুমি আমাকে মা সাজাইয়া আমাদের দলে আমাকে প্রধান করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছ। অধিকারী মহাশয়! তুমি বলিলে, অমনি আমি মা সাজটি সাজিয়া আসরে বসিলাম। তোমার যাত্রার আসরে থাকিয়া কত জনে কত আশ্চর্য্য সাজ সাজিয়া আসিতেছে আমি দেখিতেছি।

হে অধিকারী মহাশয়! তোমার সংসারযাত্রায় থাকিয়া যে কত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতেছি তাহার সংখ্যা নাই। তুমি আমা হইতেই

আমাকে কত প্রকার সাজ সাজাইয়া আনিয়া দেখাইতেছ। আমার পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী এই সমুদায় সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া প্রায় সকলই তুমি নিয়া গিয়াছ।

অধিকারী মহাশয়, যখন তুমি আমার ছেলে সাজাইয়া সংসার যাত্রার আসরে আমার নিকট আসিয়া বলিয়া দেও "এই ছেলে তোমার, তুমি ছেলে কোলে লও, ইহাকে লালন পালন কর, এ ছেলে তোমাকেই দিলাম," বলিয়া আমার কোলে ছেলে তুলিয়া দেও, তখন আমাকে মা সাজটি সাজাইয়া আসরে বসাইয়াছ। আবার তুমি আমার ছেলে সাজাইয়া আমার কোলে তুলিয়া দিলে। তখন আমি ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিলাম, সে সময় যে কি আহ্লাদ আমার মনে উদয় হইল তাহা বলিতে পারি না। সে আনন্দ বর্ণনাতীত।

অধিকারী মহাশয়! ছেলে যে কত কষ্টে পাওয়া যায় তাহা তুমি জান। সেই কষ্ট ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া ঐ ছেলেটির মুখখানি দেখিলেই জল হইয়া যায়। ছেলেটিকে যখন কোলে লইয়া বসি তখন শরীর মন এককালে যেন আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। সে আনন্দ মনে আর স্থান পায় না, তখন জ্ঞান হয় আমি একজন কি হইলাম। অন্য বিষয় দূরে থাকুক, অধিকারী মহাশয়, তোমাকেও ভুলিয়া যাই।

হে অধিকারী মহাশয়, যখন ঐ ছেলেটিকে লইয়া বসি তখন আমার মনে হয় যেন কি একজন হইলাম, যেন আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলাম। তখন কি প্রকার মনে হয়, আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার সংসার, সকলি আমার। এই প্রকার শরীর মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আপনার দেহস্মৃতি থাকে না। ঐ ছেলেটিকে পরম যত্নে বুকের মধ্যে রাখি, বোধ হয় প্রাণ হইতেও ছেলে অধিক।

অধিকারী মহাশয়, তোমার গুণ বলিব কত?—কিছুক্ষণ পরেই তুমি সেই ছেলেটিকে আমার বুকের মধ্যে আমার কোলের মধ্য হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়। অধিকারী মহাশয়, তুমি কোথা হইতে ছেলে আনিয়া দাও তাহাও আমি কিছু জানি না, কোথায় আবার লইয়া যাও তাহাও কিছু জানি না। যখন আমার কোল হইতে ছেলেটি তুমি লইয়া

যাও, সে সময় ইচ্ছা হয়, ঐ ছেলের সঙ্গে সঙ্গে যথাসর্ব্বস্ব যাউক। এবং আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অধিকারী মহাশয়, তখন তুমি সেই ছেলেটিকে লইয়া গেলে যে কষ্ট হয়, সে কষ্ট কি বিজাতীয় কষ্ট! সে বিষম কষ্টের সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। সে কষ্ট যে জানে সেই জানে, আর অধিকারী মহাশয় তুমি জান।

অধিকারী মহাশয়, তুমি কোন্ সময়ে কোন্ পালা সমাধা করিবে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান, দুই কন্যা সন্তান—এই বারটি সন্তান দিয়েছিলে, তাহার মধ্যে ছয়টি পুত্র একটি কন্যা এই সাতটি সন্তান তুমি আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ। এক্ষণে অবশিষ্ট চারিটী পুত্র একটী কন্যা এই পাঁচটী সন্তান আমার সম্মুখে রাখিয়া আমাকে দেখাইতেছ।

অধিকারী মহাশয়, তোমার একটী নাম দয়াময়। ঐ দয়াময় নামটী ত্রিজগতে বিখ্যাত আছে। তুমি নিদয় হইলেও বলিব দয়াময়। হে অধিকারী মহাশয়, তুমি আবার আমার পৌত্র, দৌহিত্র সাজাইয়া আমাকেই দেখাইতেছ। বিপিনবিহারীর দুই ছেলে, কন্যা দুইটী। দ্বারকানাথের চারিটী ছেলে, কন্যা একটী। কিশোরীলালের চারিটী ছেলে, দুইটী কন্যা। প্রতাপচন্দ্রের চারিটী ছেলে, তিন কন্যা! আমার দুই কন্যা, এক কন্যার এক ছেলে, ছোট কন্যাটীর একটী ছেলে একটী কন্যা। পৌত্র ১৪, দৌহিত্র ২, পৌত্রী ৮, দৌহিত্রী ১, সর্ব্বসমেত ২৫ জন।

দশম রচনা

সংসারযাত্রা

ওহে প্রভু বিশ্বব্যাপী, বিশ্বময় বিশ্বরূপী,
কত রূপে কত অবতার।
মহাদেবে করে মোহ, মোহিনী রূপেতে মোহ,
তব মায়া কে হইবে পার ?
তুমি হে মনের মন, জানিছ সবার মন,
অগোচর নাহি চরাচর।
শিবভক্ত শিরোমণি, নিজ দাস মনে জানি,
আলিঙ্গিয়া হৈলে হরিহর॥
তুমি প্রভু গুণবন্ত, কে পায় তোমার অন্ত,
আদি অন্ত অনন্ত অব্যয়।
তুমি হে ত্রিলোকপতি, অর্জ্জুন রথে সারথী,
ভক্ত স্থানে আছ পরাজয়॥
অন্যে কে জানিতে পারে, ভক্ত জানে ভক্তি জোরে,
আছ ভক্ত হৃদি-সিংহাসনে।
রাসসুন্দরী পদাশ্রিত, করুণা কর কিঞ্চিত,
দাসপদে রেখ হে চরণে॥

হে প্রভু করুণাময়, ওহে ভক্তবৎসল অধমতারণ, তোমার লীলা বেদবিধির অগোচর। 'আমি কি বর্ণিব গুণ, পঞ্চমুখে পঞ্চানন, অনন্ত না পায় অন্ত যার!'

অধিকারী মহাশয়, আমা হইতে আমাকে কত প্রকারই সাজ দেখাইয়া লইলে। কতকগুলি পুত্র, কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র, আমাকে দেখাইয়া তুমি লইয়া গিয়াছ। এক্ষণে বিপিনবিহারীর দুই কন্যা মাত্র। দ্বারিকানাথের তিন পুত্র, এক কন্যা। কিশোরীলালের দুই পুত্র, তিন কন্যা। প্রতাপচন্দ্রের তিন কন্যা, তিন পুত্র। আমার এখন একটী কন্যা, শ্যামসুন্দরী নাম। সে কন্যাটীর এক পুত্র,

এক কন্যা। বারটী সন্তান তুমি সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দিয়াছিলে, ছয়টী পুত্র এক কন্যা আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ, এক্ষণে চারিটী পুত্র এক কন্যা তোমার যাত্রার আসরে রাখিয়া আমাকে দেখাইতেছ। আর আটটী পৌত্র, একটী দৌহিত্র, আর নয়টী পৌত্রী, একটী দৌহিত্রী এখন পর্য্যন্তও দেখাইতেছ। অধিকারী মহাশয়, তুমি কোন্ সময়ে কোন্ পালা সমাধা করিবে তাহা তুমিই জান।

হে অধিকারী মহাশয়, আমার শেষকাণ্ডে কি কাণ্ড করিবে তাহা তুমি জান, তুমি যাহা কর সেই ভাল। কিন্তু আমার শেষের সময় দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিতে হবে।

অধিকারী মহাশয়, তোমার সংসার-যাত্রাটি বড় শক্ত যাত্রা। এই সংসার-যাত্রায় দেব, দৈত্য, মুনি, ঋষি আদি সকলেই আসিয়া থাকেন। কেহই সংসার-যাত্রায় না আসিয়া থাকিতে পারেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার নিজের যাত্রায় তুমিই কতবার কত সাজে সাজিয়া আসিয়া থাক। হে অধিকারী মহাশয়, তুমি ত্রেতাযুগে তোমার যাত্রার আসরে কৌশল্যারাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি এক অঙ্গে চারি অংশ হইয়া দশরথ রাজার পুত্র হইয়াছিলে। তোমাদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন।

হে অধিকারী মহাশয়, তুমি যে প্রয়োজনে সংসার-যাত্রায় আসিয়া কৌশল্যারাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সেই প্রয়োজন সাধন করিয়া, রাক্ষস বংশ ধ্বংস করিয়া ক্ষত্রিয় বল প্রকাশ করিয়া কিছুদিন অযোধ্যায় রাজা হইয়াছিলে। তোমার মনে যাহা আছে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। সেই রামচন্দ্র যাত্রার পালাটি সমাধা করিয়া পরে তুমি তোমার সেই রাজরাজেশ্বর রামচন্দ্র সাজটি পরিত্যাগ করিয়া হাত পা ধুইয়া তুমি আবার অধিকারী মহাশয় হইয়া তোমার সংসার যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ।

হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সে রামযাত্রার পালার নাম হইয়াছে রাম অবতার। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া বাল্মীকি মুনি ঐ রাম নামটী দিয়া জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন। সেই রাম নামে কত গুণ! হেলায়

যদি কেহ মুখে একবার ঐ রাম নামটী বলে, মৃত্যুকালে রাম বলিয়া ডাকে, তাহার শমন ভয় থাকে না। একবার রাম নাম বলিলে কোটী জন্মের পাপ বিনাশ হইয়া যায়।

রাম নাম গুণের আর নাহি পারাপার
যে নামে আনন্দ হর হৈল দিগম্বর ॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাকে সদা করে ধ্যান।
যে নাম নারদ মুনি বীণায় করে গান ॥

একাদশ রচনা

সংসারযাত্রা

রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ রাক্ষসের রিপু।
নরসিংহরূপে বধ হিরণ্যকশিপু ॥
নম প্রভু রামচন্দ্র রাজীব লোচন।
বামেতে জানকী দেবী দক্ষিণে লক্ষ্মণ ॥
দয়ার সাগর দীন দয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নব দূর্ব্বাদল শ্যাম ॥
না জানি ভকতি স্তুতি আমি নারী ছার।
তব গুণ বর্ণিবার কি শক্তি আমার ॥
তুমি হে দেবের দেব, দেব নারায়ণ।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি পঞ্চানন ॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর।
বাঞ্ছার বরণ তুমি, তুমি ধনেশ্বর ॥
তপস্বীর তপ তুমি, মুনিগণের সিদ্ধি।
প্রলয় পালন তুমি, তুমি জলনিধি ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
সত্ত্ব রজঃতম গুণে তুমি বিশ্বময় ॥
তোমার সৃজন প্রভু এ তিন ভুবন।
তোমা পরে রক্ষা হেতু আছে কোন্ জন ?

থাকিতে তুমি হে নাথ ডাকিব কাহারে ?
কাহারি বা সাধ্য আছে রক্ষা করিবারে ?
মহিমা গভীর বীরমিহির তৎসজ্জ।
রাসসুন্দরীকে দেও হে ঐ পদপঙ্কজ॥

অধিকারী মহাশয়, তুমি বহুরূপী। তুমি কখন্ কি সাজিয়া যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা তুমি জান। তুমি দ্বাপরযুগে কৃষ্ণচন্দ্র রূপটি ধারণ করিয়া তোমার সংসার-যাত্রার আসরে আসিয়া মথুরায় দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি কংশ কারাগারে দৈবকী গর্ভে জন্মমাত্রেই শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপ হইয়া দৈবকী বসুদেবকে দর্শন দিয়া তৎক্ষণাৎ গোকুলে আসিয়া যশোদানন্দন হইলে। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার কখন্ কি খেলা খেলাইতে ইচ্ছা, তাহা অন্যে কে জানিবে ? তোমার মনের কথা তুমিই জান। তুমি কিছু দিবস নন্দনন্দন হইয়া গোকুলে বাস করিয়াছিলে, পরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অধিষ্ঠান হইলে। সেই মধুর বৃন্দাবনে গোপ-গোপীগণের সঙ্গে তোমার মিলন হইল। তখন তুমি সেই মধুর বৃন্দাবনে ব্রজশিশুগণ সঙ্গে বনে বনে, যমুনার তীরে ধেনু চরাইয়া বেড়াইতে। তোমার লীলা গুণ বর্ণনাতীত।

তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ভগবানচন্দ্র। তুমি বৃন্দাবনে ব্রজশিশু সঙ্গে বনে বনে রাখাল বেশে ধেনু রাখিয়াছ। ব্রজশিশুগণ সঙ্গে আর কত খেলা করিয়াছ। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই শ্রীবৃন্দাবনে সেই মধুর ব্রজলীলা দর্শন প্রার্থনায় চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেব ঋষিগণ কত যুগ-যুগান্তর অনাহারে তপস্যায় প্রাণধারণ করিয়া আছেন। আমি ক্ষুদ্র জীব, তাহে ছার নারীকুলে জন্ম। তোমার ব্রজলীলার মাহাত্ম্য আমি কি জানিতে পারি ? বনের পাখী যদি সাধুসঙ্গ ভাগ্যক্রমে পায়, সাধুসঙ্গ গুণে পাখী রাধাকৃষ্ণ নামটী উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে। সাধুসঙ্গের গুণে অপবিত্র দেহ পবিত্র হয়। আমি এমনি হতভাগ্য নরাধম, পশুপক্ষী হইতেও অপদার্থ। আমি সাধুদর্শন পাইলাম না। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার চরণে কোটী প্রণাম, তুমি নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করিও।

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজলীলা দেখিবেন বলিয়া মহাদেব যোগীবেশ ধারণ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। অধিকারী মহাশয়, তুমি শ্রীনন্দের নন্দন হইয়া যশোদার কোলে বসিয়া যশোদায় মা বলিয়া যশোদার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছ। মা যশোদা ধড়া-চূড়া পরাইয়া রাখাল বেশে সাজাইয়া দিয়াছেন, তুমি ব্রজ গোপীদের সঙ্গে, ব্রজশিশুগণের সঙ্গে বনে বনে বনবিহার করিয়াছ। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই মধুর ব্রজলীলা, প্রেমরত্নপূর্ণ সেই বৃন্দাবনেই এই ব্রজলীলা শেষ হইলে, তোমার মনের যে বাঞ্ছা সে সমুদায় পূর্ণ করিয়া তুমি কংস যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া অক্রুর খুড়ার সঙ্গে মথুরায় চলিয়া গেলে। তোমার লীলার শেষ নাই। তুমি মথুরায় গিয়া মাতুলবংশ রাজাকে ধ্বংস করিয়া তোমার ব্রজের বেশ ধড়া-চূড়া মোহনবাঁশী পরিত্যাগ করিয়া লাল পাগড়ি জামা জোড়া পরিয়া মথুরার রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলে।

হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সংসার-যাত্রায় তুমি আসিয়া কত প্রকার সাজ সাজিয়া পৃথিবী ধন্য করিয়াছ। তোমার লীলা তোমার মন তুমি জান, অন্যে কে জানিবে?

অধিকারী মহাশয়, এই প্রকার রাজা হইয়া কিছু দিবস মথুরায় থাকিয়া, পরে তুমি সংসারী হইয়া, বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সংসারে যত প্রয়োজন, দ্বারকা লীলায় সে সমুদায় বাসনা পূর্ণ করিয়াছ। হে অধিকারী মহাশয়, তুমি ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ একেবারে সাজিয়া দাঁড়াইল। তখন তুমি দেখিলে যে তোমার সংসারযাত্রায় তোমার বংশাবলী লইয়া দাঁড়াইতে আর স্থান থাকিল না।

অধিকারী মহাশয়, তুমি ইচ্ছাময়। তোমার যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই হয়। তখন তোমার ঐ ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ তুমি একেবারে ধ্বংস করিয়া, তুমি যে সাজে আসরে দাঁড়াইয়া ছিলে সেই সাজটী পরিত্যাগ করিয়া, হাত পা ধুইয়া, আবার অধিকারী মহাশয় হইয়া তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইলে। অধিকারী মহাশয়, তোমার লীলা অনন্ত অপার! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম, আমাকে ঐ চরণে স্থান দিও।

দ্বাদশ রচনা

সংসারযাত্রা

ওহে কৃষ্ণ রাধাকান্ত, কে জানে তোমার অন্ত
তুমি আদি অন্তের অন্তর্য্যামী।
পুরাণেতে আছে ব্যক্ত, ভবাদি স্তবে অসক্ত,
নারী জাতি কি জানিব আমি॥
দেহ ইন্দ্রিয় আছে যত, তব চরণে অর্পিত,
জ্ঞান বত, তুমি যজ্ঞ দান।
না জানি ভকতি স্তুতি, অবলা অজ্ঞান, মতি,
তুমি হে সম্বল ধন প্রাণ॥
ভরসা ঐ পদারবিন্দ, অধমতারণ দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু করহে উদ্ধার।
তব নাম কৃপালেশে, সলিলে পাষাণ ভাসে,
শিলা হতে আমি কত ভার॥
তুমি ভকতবৎসল, ভকত জনার বল,
ভক্তাধীন নাম হৃষীকেশ।
কিন্তু তাই ভাবি মনে, আমি পাব কোন গুণে,
নাহি মম প্রেম ভক্তিলেশ॥
তথাপি মনের সাধ, পুরাইতে হবে নাথ,
কৃপাসিন্ধু হে রাধারমণ।
বহুদিন অভিলাষী, রাসসুন্দরী দাসের দাসী,
দিতে হবে যুগল চরণ॥

হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই শ্রীবৃন্দাবনের ধড়া-চূড়া, মোহনবাঁশী, সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা রূপটি, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পালাটি সমাধা করিয়া তুমি আর কি নূতন নূতন পালা করিবে, সেইটি স্থির করিয়াছিলে।

যখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগ পরিবর্ত্তন হইয়া কলিযুগ প্রবর্ত্তন হইল, অধিকারী মহাশয়, সেই সঙ্গে তুমি তোমার সংসার-যাত্রায় আসিয়া শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হইয়াছিলে এবং এবার

তুমি সম্পূর্ণ নূতন নাম ধারণ করিয়া সেই তারকব্রহ্ম হরিনাম সঙ্গে করিয়া তোমার এই সংসার-যাত্রায় আসিয়াছিলে। হে অধিকারী মহাশয়, এই গৌরাঙ্গচন্দ্র নামটী ধারণ করিয়া তোমার সেই হরিনাম সংকীর্ত্তন জগতে প্রকাশ করিয়া ঐ হরিনাম দিয়া জগতের দীন, দুঃখী, পাপী, তাপী, অন্ধ, আতুর সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলে। এখনও তোমার সেই হরিনামের ধ্বজা উড়িতেছে।

অধিকারী মহাশয়, তুমি যে কোন্ সাজটি সাজিয়া তোমার যাত্রায় আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা অন্যে কে জানিবে, তোমার মন তুমিই জান। তোমার সেই যে ব্রজের বেশ বাঁকা রূপ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, ধড়া-চূড়া মোহনবাঁশী সেরূপ কোথা লুকায়েছ ?

গীত

ছিল কালবরণ বাঁকা রূপ ত্রিভঙ্গ,
নদে এসে হয়েছে হে গৌরবরণ গৌরাঙ্গ।
(হে ব্রজনাথ, তোমার ব্রজের চিহ্ন কিছুই নাই হে)
কোথা লুকায়েছ সে অঙ্গ, হলে কাঁচা সোণা গৌরবরণ গৌরাঙ্গ।
হে ব্রজনাথ ব্রজে রাধা বলি বাজাতে বাঁশী
এখন হরি বলে বাজাও মৃদঙ্গ॥

হে অধিকারী মহাশয়, এই কলিযুগে তোমার সেই কালবরণ রাই রূপেতে গিল্টি করা হইয়াছে, এখন তুমি তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া গৌরচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছ।

হে অধিকারী মহাশয়, তুমি কিছু দিবস নবদ্বীপে শচীনন্দন হইয়াছিলে, তোমার নাম ছিল নিমাই পণ্ডিত, ঐ সময়ে একটি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জয়পত্র লইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তখন তুমি সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়াছিলে।

পণ্ডিতকে জয় করে হৈল নামে ধ্বান।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥

এই প্রকার নবদ্বীপে কিছুদিন সংসারী হইয়াছিলে। পরে তোমার সে বেশটি পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর চাঁচরকেশ তোমার শিরে ছিল, সেই

কেশ মুণ্ডন করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ডোর কৌপীন পরিয়া দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাজ সাজিয়া দাঁড়াইয়াছিলে; তখন তোমার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

হে অধিকারী মহাশয়, যখন প্রথমে তুমি তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইলে, তখন তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়া তোমাকে সকলে মান্য করিত ও প্রণাম করিত। পরে যখন তুমি সন্ন্যাসী হইয়া দাঁড়াইলে তখন তোমার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটি জগতে বিখ্যাত হইল, আর তখন তোমাকে সকলে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়া মান্য করিতে লাগিল।

অধিকারী মহাশয়, তোমার মাতা শচীঠাকুরাণী ও তোমার ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ইঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে।

ত্রয়োদশ রচনা

সত্য ত্রেতা দ্বাপর পরে, যুগধর্ম্ম অনুসারে
সদর্পেতে কলি রাজা হয়।
সাধুকে না করে গণ্য, পাপে পূর্ণ মতিচ্ছন্ন,
ঘোর কলি অন্ধকারময়॥
কলি রাজা আগমনে, সঙ্গে সৈন্য অগণনে,
পাপ, তাপ, ক্রোধ, হিংসা যত।
উড়িল কলির ধ্বজা, শাসনে রহিল প্রজা,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ হত॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
শচী গর্ভে হইলা উদয়।
মোহাবর্ত্ত হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়।
এনে হরিনাম সঙ্গ, রঙ্গে ভঙ্গে গোরসিংহ,
হুহুঙ্কার বিশাল গর্জ্জনে।
নাম দাপে যম কাঁপে, কলির দর্প হইল খর্ব্ব
কলি রহিল শশঙ্কিত মনে॥

ভক্তে অনুগ্রহ করি, ভকতবৎসল হরি,
নামামৃতে ভাসালে অবনী ॥
হরিনাম সংকীর্ত্তনে, আনন্দিত ত্রিভুবনে,
গগন ভেদিয়া হরি ধ্বনি ॥
পেতে হরিনামের খেলা, মাতালে মাতালে মেলা,
হাসে কান্দে নাচে উভরায়।
নিজ নামানন্দে মত্ত, না জানি আপন তত্ত্ব,
হরিনাম জীবেরে বিলায় ॥
বাজে খোল, বীণা, বংশী, মাঝে নাচে গৌরশশী,
হরিধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া।
ব্রজলীলা প্রেমরস, ছিল অতি অপ্রকাশ,
নিজে এনে প্রকাশে নদীয়া ॥
গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন
স্নেহের নাম ছিল গোপনেতে ॥
নিজে এসে গৌরহরি, পাগলা নিতাই সঙ্গে করি,
যেচে যেচে বিলায় জগতে ॥
পাপী তাপী ছিল যত হৈল মহা ভাগবত,
ভক্তি তত্ত্ব সদা অধ্যয়ন।
নিজ শাস্ত্র পরিহরি, যবনে বলয়ে হরি,
নাম মদে মাতিল ভুবন ॥
ভাসিল ধরণী প্রেমে, তারকব্রহ্ম হরিনামে,
ধন্য ধন্য কলিযুগ ধন্য।
ঐ পদ সতত হেরি, বাঞ্ছা করে রাসসুন্দরী,
পূর্ণ কর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

হে নাথ পতিতপাবন, হে প্রভু ভক্তবৎসল, করুণাময়! তুমি নবদ্বীপে শচীগর্ভে উদয় হইয়া পৃথিবী ধন্য করিয়াছ। তোমার প্রেমবন্যায় জগৎ প্লাবিত হইয়াছে। হে প্রভু কৃপাসিন্ধু হরি! তুমি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া গৌরহরি নামটি ধারণ করিয়াছিলে। তাতেও তুমি তোমার সকল জগৎ স্বজন করিতে পারিলে না। পরে সন্ন্যাসী হইয়া তুমি সেই সন্ন্যাসীর বেশে ঘরে ঘরে হরিনাম যেচে যেচে

পাপী, তাপী, অন্ধ, আতুর সকলকে দিয়াছ। হে গৌরকিশোর, আমি নরাধম, তোমাকে চিনিনা, তোমাকে ডাকিতেও জানি না।

হে প্রভু গৌরকিশোর, তোমার এই সংসার-যাত্রার তুমি অধিকারী মহাশয়। আমাকে ৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার যাত্রার আসরে বসাইয়া রাখিয়াছ। আমি একাসনে ৮৫ বৎসর বসিয়া তোমার আশ্চর্য্য কাণ্ড মাণ্ড সমস্ত দেখিতেছি। হে প্রভু দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া ৮৫ বৎসর নিরাপদে আমাকে জীবিত রাখিয়াছ। এপর্য্যন্ত আমার দশ ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই, একমত সব চলিতেছে।

হে অধিকারী মহাশয়, আমি যদি রোগাচ্ছন্ন হইতাম, তাহা হইলে ৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমার উত্থানশক্তি থাকিত না, শয্যাগত হইতাম। তাহা হইলে আমার জীবন্মৃত্যু হইত।

হে নাথ দয়াময়, হে দুর্ব্বলের বল, হে বিপদভঞ্জন, হে অধমতারণ, তুমি এই অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া ৮৫ বৎসর আমাকে নিরাপদে জীবিত রাখিয়াছ। আমার শেষ কাণ্ডে তুমি কি কাণ্ড করিবে তাহা তুমি জান। হে গৌরকিশোর, আমার অন্য বিষয় যাহা কর সে ভাল, কিন্তু আমার শেষের সময় নিজগুণে দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিতে হবে।

চতুর্দ্দশ রচনা

কলিযুগ করি ধন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
সাঙ্গ পাঙ্গ গৌরাঙ্গসুন্দর।
আর কি ভাব উদয় মনে, মায়াপুরে তুলসী বনে,
হয়েছ হে গৌরকিশোর !
নবদ্বীপ ত্যজ্য করি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরি,
জগন্নাথে ছিলা অধিষ্ঠান,
তাহাতে করিয়া কুহ, নিগমে গোপনে রহ,
বেদ বিধি না পায় সন্ধান।
তুমি না জানালে জানে, কে আছে এ ত্রিভুবনে,
ছিন্ন ভিন্ন হইল মেদিনী,
জীবে হ'য়ে কৃপাবান শমনে করিতে ত্রাণ,
নিজগুণে প্রকাশ আপনি।
কিশোর কিশোরী রূপ, মায়াপুরে অপরূপ,
পুনরপি হয়েছ যুগল,
হেরিয়ে ভকতগণ, আনন্দে হ'য়ে মগন,
কান্দে, নাচে, বলে হরিবোল।
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যখন যে ইচ্ছা হয়,
সেইরূপ দাঁড়াও সাজিয়া,
রাসসুন্দরীর মনোগত, তব পদে অবিরত,
লেগে থাকে চন্দন হইয়া ॥

পঞ্চদশ রচনা

আজি আমি কি অপরূপ দেখেছি স্বপন।
আজি যেন গিয়াছি সেই বৃন্দাবন॥
দেখিলাম সেই কৃষ্ণ নিকুঞ্জ কাননে।
চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছে সব সখীগণে॥
ধড়া-চূড়া রঙ্গের বেশ বাধা রয়েছে।
বনফুলের মোহনমালা গলে দুলিছে॥
নবীন নীরদ জিনি শরীরের শোভা।
কোটি পূর্ণচন্দ্র জিনি প্রভা মনোলোভা॥
মালতী মালাতে বদ্ধ চূড়া সমুজ্জ্বল।
কৌস্তুভ মণিতে আলো করে বক্ষস্থল॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ জিনি যুগল নয়ন।
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গে রত্ন বিভূষণ॥
রূপেতে গন্ধর্ব্ব দর্প করিয়াছে জয়।
ভুবন মোহন রূপ রূপেরি আলয়॥
কিসেতে তুলনা দিব নাহি সমতুল।
চরণ কমল দলে কত চাঁদের ফুল॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ বামেতে কিশোরী।
ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ রূপ মনোহারী॥
যুগল কিশোর রূপ হেরিয়া নয়নে।
চন্দন তুলসী পুষ্প দিতেছি চরণে॥
স্বপনে এরূপ হেরি প্রফুল্ল হৃদয়।
রাসসুন্দরীর বাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়াময়॥

১২১৬ সলে চৈত্রমাসে আমার জন্ম হইয়াছে, এক্ষণে ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৭ বৎসর, আমার ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের অবস্থা এবং মনের অবস্থা আমার জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এদিকে আর ২৫ বৎসর আমার জীবনের বৃত্তান্ত লেখার দরকার বটে। এক্ষণে আমার শরীরের অবস্থা যে প্রকার হয়েছে সে বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হয়েছে। আর অধিক কি বলিব। যিনি আমার

অন্তরে সততই বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি আমার মনের অবস্থা স বিলক্ষণরূপে জানিতেছেন।

সংসারী বিষয় ভাল-মন্দ লোকের যাহা কিছু হইয়া থাকে, সে সমুদয় এক প্রকার সকলই হইয়াছে। সংসারের সম্পত্তি পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র এই দিকে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা জগদীশ্বর দয়া করে সব দিয়াছিলেন, এখন তিনি কতক কতক নিয়াছেন। দশটি পুত্র দুইটি কন্যা এই বারটি সন্তান আমার জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে ছয়টি পুত্র একটি কন্যা এই সাতটি সন্তান তিনি আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট চারিটি পুত্র একটি কন্যা আমার সম্মুখে রাখিয়া দেখাইতেছেন।

আমার জীবন-চরিত—দ্বিতীয়ভাগ—এই পর্য্যন্তই ক্ষান্ত থাকিল। আমার জীবনান্ত হইলে আমার বংশের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি আমার শেষ ভাগ লিখিবেন।

এই বইখানি আমার নিজ হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না। অধিক লেখা বাহুল্য। তোমরা সব জান, যাহাতে পরিশ্রম সফল হয় করিবা।

আমার এই বইখানি ছাপান হইলে ঐ বই বিক্রয় হইয়া ছাপানর দাম দিয়া পরে যে কিঞ্চিৎ থাকিবে ঐ টাকা আমানত থাকিবেক। আমার ছেলেদের ত কথাই নাই। পরে আমার বংশের মধ্যে যে থাকিবেক, প্রতি বৎসর মদনগোপালের নিকট ঐ টাকা দিয়া মহোৎসব হইবেক, এই আমার প্রার্থনা।

মনশিক্ষা

মনরে আমার, আমি তোমার তোমায় আপন জানি।
আমার দেহের মধ্যে তুমি প্রবল, আর সব নিছুনি॥
এই ভবে আসা তোর ভরসা, তোমার করি জোর।
তুমি ভবের মেলায় ধূলার খেলায় করলে বাজি ভোর॥
এই মিছা ধন জন, করিছ যতন, সকলি পড়িয়া রবে।
ভেবে দেখ মন, একাই এসেছ, একাই যাইতে হবে॥

এই যে নিজ পরিবার করে আপনার, পালিছ জনম হ'তে।
শমন ভবন গমনকালে কেহত যাবেনা সাথে॥
এই মিছা ধন জন, পরের কারণ, যতন করিয়া মর।
যদি পেয়েছ দুর্ল্লভ মানব জনম তাহার কর্ম্ম কর॥
জীব আইসার কালে জীবেরে প্রভু আজ্ঞা করেছিল।
ভারতবর্ষে জন্ম নিয়া চারি কর্ম্ম কর॥
করিও জ্ঞান কর্ম্ম, গুরুর আজ্ঞা সত্য করি মান।
পুণ্য কথা যথা তথা শ্রবণ ভরে শুন॥
অভ্যাগতে মিষ্টভাষায় অন্ন দিয়া খেও।
সাক্ষ্য দিতে সত্য বিনা মিথ্যা না বলিও॥
চারি কর্ম্মের কোন কর্ম্ম করি নাই আমি।
যখন জিজ্ঞাসিবেন এই বলিয়া সাক্ষী দিবে তুমি॥
জাননা জন্ম যখন মৃত্যু যখন সেই বা কেমন দিন।
যেমন কাল দীঘিতে বেড়িবে জালে জলের মধ্যে মীন॥
তখন ত জানতে পাবে কার বা কেবা কার লেগে কে মরে।
ঘরের বাহির হতে শমন বাধিবে হাতে গলে।
জ্ঞাতি বন্ধ যারা বলিবে তারা কেন বিলম্ব কর?
যার প্রেম তার সঙ্গে গেল শীঘ্র নিয়া চল।
অঙ্গের বসন ভূষণ অঙ্গাভরণ গৌরব করে সবে।
যাবার বেলা ছিন্ন বস্ত্র তাইবা কোথা রবে॥
এই যে নারীর সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ভেসেছ দিবানিশি।
তখন কার রমণী কোথা রবে মিছা ধন্ধবাজি॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তত্ত্ব নাহি জান।
এ দেহ অনিত্য, চিত্তে সত্য করি মান॥
দেহের যতন করিছ কত পুড়ে ভস্ম হবে।
ইহা দেখে শুনে যে না বুঝে ধিক্ থাকুক সে জীবে॥
এই জীবের কথা বলে বৃথা কাব্য করে মরি।
অন্তরালে ধন্ধবাজি ঐ নিবেদন করি॥
এই যে হাতী ঘোড়া শালের জোড়া সকলি পড়ে রবে।
তুলিয়া বাঁশের খাটে শ্মশান-ঘাটে নিয়া বিদায় দিবে॥
কতকগুলি তৃণ কাষ্ঠ অনলে সাজাইয়া।
পুত্র কন্যা ঘরে যাবে শ্মশানে রাখিয়া॥

শ্মশানে অনলরাশি ভস্মরাশি শমন ভবন যেতে।
সঙ্গে যাবে কালের কোটাল, কেউ যাবেনা সাথে॥
কোটালের ডাণ্ডা হাতে মারবে মাথে বলবে চল দুরাচার পাপী।
তখন পড়বে কেঁদে, তুলবে বেঁধে, করবে ছোটা বাজী॥
তখন নয়ন তুলে দেখবে চেয়ে, কেউ নিকটে নাই।
মনরে কার বেগার খেটে এলাম কি ধন নিয়ে যাই॥
কোথা হোতে কার নিকটে কেন লয়ে যায়।
আপন বলিয়া যারে ভাবিলাম সেবা কোথা রয়॥
বড় বাড়ী বড় ঘর রহিল পড়িয়ে।
যেন হাট ভাঙ্গিলে কে কোথা যায় কেউ দেখেনা চেয়ে॥
ভাই বন্ধু আর পরিবার সম্পত্তির সাথী।
শমন ভবন গমন কালে কেবল গোবিন্দ সারথী॥
ধন জন পুত্র কন্যা সব অকারণ।
মরণ সময় কেবল আছেন শ্রীমধুসূদন॥
ওহে বিপদবারি, রাসসুন্দরী ভেবে ব্যাকুল মন।
রাসসুন্দরীর সেই সময়ে দিও হে দর্শন॥